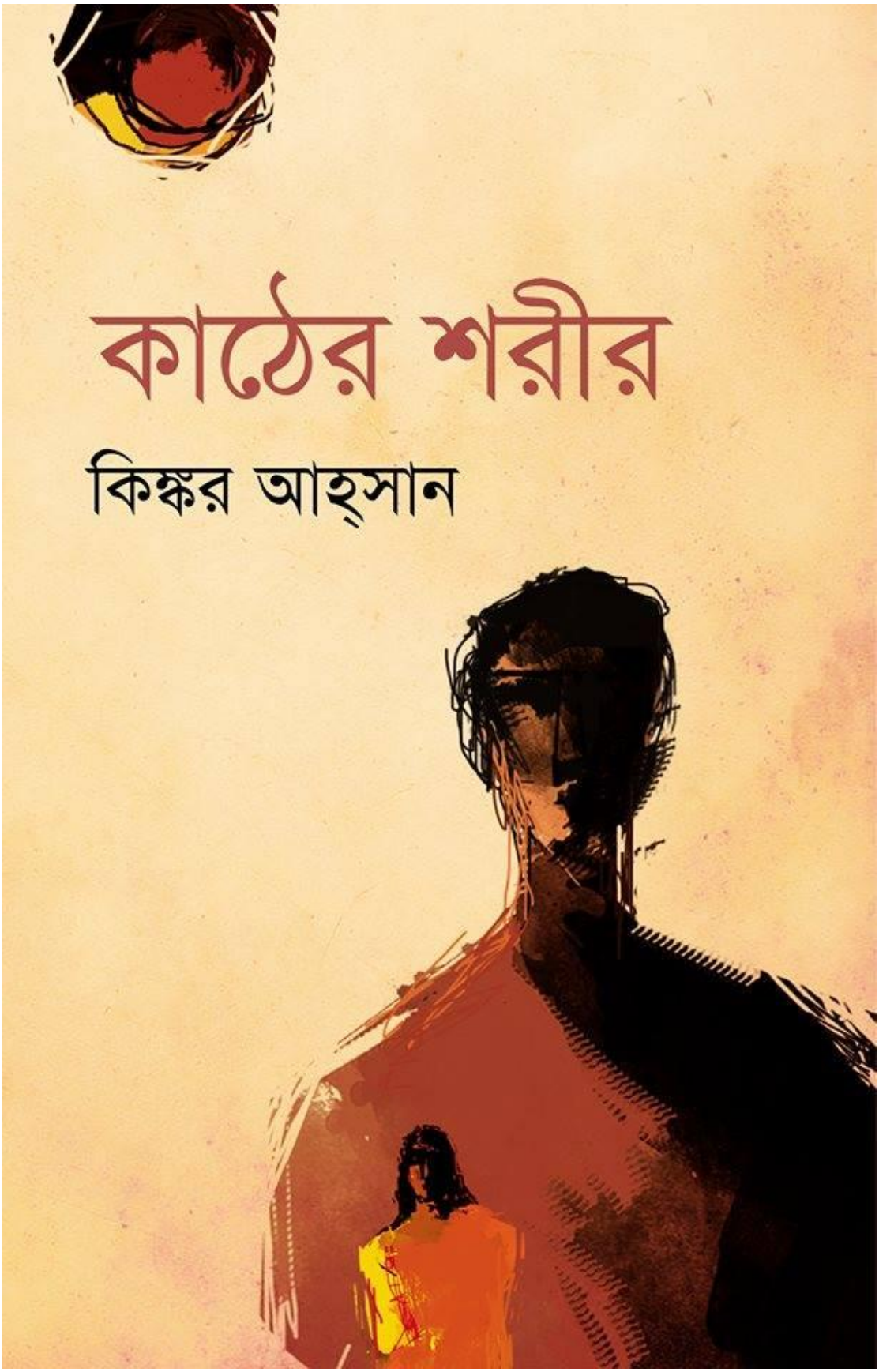
কাঠের শরীর
কিঙ্কর আহ্সান

জীবন-চিত্রনাট্য-খসড়া
তপোভঙ্গ
উপাসনা
কাঁচা ধানের কবর
কাঠের শরীর
চা;ঘুম
বাগান বিলাস
পাতকী
মোহর
ছায়ালোকে মায়া

**জীবন-চিত্রনাট্য-খসড়া**

---

---

১.

মাঝনদীতে পৌঁছে গেছে লঞ্চ।
রাত গভীর হয়নি এখনো। তবে নিকষ কালো আঁধারে ঢেকে আছে চারপাশ। কালো মেঘ আর আঁধারের দাপটে হারিয়ে গেছে আকাশের কোনো এক কোনায় লুকিয়ে থাকা চাঁদ ও চাঁদের আলো।
একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। বৃষ্টি হচ্ছে খুব। ঝড়ো হাওয়ায় বেসামাল হয়ে উঠছে লঞ্চটা।
লঞ্চের রেলিংয়ের একপাশে দাঁড়িয়ে নদীর কালো জল দেখতে থাকে সুজন। আঁধারের আড়াল হতে জলকে আলাদা করে দেখাটা কঠিন কাজ। তবুও তাকিয়ে থাকে সে। সময় কাটানোর জন্য তাকিয়ে থাকা।
এমন আবহাওয়ায় লঞ্চে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হলো না। কিন্তু যেতেই হবে। মায়ের কড়া আদেশ। নিজের বোনের মেয়ের আকিকার অনুষ্ঠানে নতুন বউ নিয়ে সুজন থাকবে না এটা কেমন কথা!
সুজন বুকপকেটে থাকা শেষ সিগারেটটা বের করে ধরায়।
কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে, ন্যাতান্যাতা হয়ে আছে সিগারেটটা। ঝড়ো হাওয়ায় দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালাতে কষ্ট হয় খুব। ধোঁয়া ভেতরে যেতেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে মন। একটু আগে বউয়ের সাথে হওয়া কঠিন ঝগড়াটার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করে সে।
আজ একা হলে অবশ্য বাসে করে বরিশালে যেত সুজন। কিন্তু সাথে বউ আছে। নতুন বউ। তাই যত বিপত্তি!
সড়কপথে মেয়েমানুষ নিয়ে এতটা দূরে যাত্রা করাটা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া লঞ্চের ছিমছাম, দারুণ কেবিনের ভেতর বন্দি হয়ে ভালোবাসাবাসি করার লোভটা সামলাতে পারেনি সে।
লাভ হয়নি। লোভটা বেশি ছিল বলেই হয়তো ভালোবাসাবাসির মুখে ছাই দিয়ে রাগ করে কেবিন বন্ধ করে বসে আছে বউটা।
সুজনকে ঢুকতে দিচ্ছে না কেবিনের ভেতরে। এই ঝড়-বৃষ্টি, শীতল হাওয়ার ভেতরেও তাই দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বাইরে।
বউয়ের নতুন চাকরি। তিন কি সাড়ে তিন মাস হয়েছে অফিসে যাচ্ছে সে। এর মাঝেই ছুটি নেওয়ার ইচ্ছে ছিল না বউটার। কিন্তু মায়ের কথা তো ফেলার উপায় নেই। মায়ের মন রক্ষা করতে গিয়েই বউয়ের সাথে লেগেছে ঝগড়াটা।
ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর মা-ই অমানুষিক পরিশ্রম করে সুজন আর তার একমাত্র বোনটিকে বড় করেছে। কখনো বুঝতে দেয়নি সংসারের কষ্ট। মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করার একটা ব্যাপার আছে তাই।
মাকে ভয় পায় সে। অবশ্য এ ভয়ের সাথে মিশে আছে ভালোবাসাও। এত বড় হয়ে গেল তার পরও মায়ের আদেশ অমান্য করার সাহস সুজনের হয়নি। হোক চায়ও না সে। এ জন্য যদি বউয়ের সাথে লড়াই হয় তো হোক।
‘চলো। ভেতরে যাবে চলো। বৃষ্টিতে ঠান্ডা লেগে যাবে।’ মিষ্টি কণ্ঠ শুনে পেছনে ফিরে তাকাতেই সুজন দেখতে পায় বউকে। মনটা ভালো হয়ে যায়। হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে নদীতে। বউ সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে না তার।
‘যাব না আমি ভেতরে। ঠান্ডা লাগে লাগুক। জ্বর হোক, নিউমোনিয়া হোক, ক্যান্সার হোক। মরে যাই। আমি মরলেই তো তুমি খুশি।’ একসাথে এতগুলো কথা বলে থেমে যায় সুজন। কথাগুলোতে আবেগ একটু বেশি বেশি হয়ে গেল মনে হয় । সিনেমার মতন। ভুল হয়ে গেল। বড় ভুল। মেয়েরা ছেলেদের অতি আবেগ পছন্দ করে না।
‘বৃষ্টিতে ক্যান্সার হয় বলে শুনিনি কখনো। যাহোক, তোমার মায়ের কথামতোই তো যাচ্ছি। দয়া করে ব্যাপারটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করো না। কেবিনের ভেতরে চলো। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে।’
‘না, যাব না। কক্ষনো যাব না। সারা রাত এই জায়গাতে থাকব।’
‘না গেলে আমার খুব একটা ঝামেলা কিন্তু হবে না। বরং আরাম করে ঘুমাতে পারব। শেষবারের মতো বলছি ভেতরে চলো।’
হঠাৎ বাজ পড়ে কাছাকাছি কোথাও।

সিনেমার মতোন করে ভয় পেয়ে সুজনকে জাপটে ধরে বউটা। মন ভালো হয়ে যায়। মেয়েদের এই হুটহাট ভয় পাওয়াটা সুজনের খুবই পছন্দ।
লঞ্চের করিডরে লোকজন নেই কেউ তেমন একটা। শুধু পাশের কেবিন থেকে বের হয়ে সোমত্ত একটা মেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা না থাকলে বউটাকে আরাম করে জড়িয়ে ধরা যেত।
'দোহাই লাগে তোমার। চলো, ভেতরে চলো। বাইরে ভয় লাগছে খুব।'
'ভয়ের কী, আমি আছি না।' সুযোগ পেয়ে নিজের পৌরুষত্বের প্রমাণটা দিয়ে নেয় সুজন।
হঠাৎ করেই সব কিছু ভালো লাগতে শুরু করে তার। এই ঝড়, লঞ্চের দুলুনি, বৃষ্টি। সব। সব কিছু।
বউকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কেবিনের ভেতর ঢুকে যায় সুজন।
এ মুহূর্তে শুধু বউকে নিয়েই ভাবতে চায় সে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও, নদীর জল ডাঙ্গায় উঠে আসলেও, আঁধার ভেঙে লঞ্চের গায়ে পড়লেও কোনো কিছুকে পরোয়া করে না এখন আর।
এখন ফুল ফুটবে। হুঁশ লোপ পাবে। আর হয়তোবা জন্ম হবে নতুন কোনো গল্পের।

**২.**

আমেনার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে।
ইচ্ছে করছে ডাক ছেড়ে হাউমাউ করে বিলাপ করতে করতে কাঁদতে। কিন্তু উপায় নেই। এখন কান্নার সময় হলেও তাদের কাঁদা নিষেধ।
কাঁদলেই বিপদ। ভয়ংকর বিপদ।
পাশেই তার বসে আছেন বড় ভাইজান। সে সবাইকে সামাল দিয়ে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে উতলা হয়ে উঠছেন নিজেই। একটু পর পরই ফোঁপাতে ফোঁপাতে ধরা গলায় সবাইকে বলছেন, 'চোপ। একদম চোপ। কাঁদবি না কেউ। কাঁদবি না। কেবিনের ভেতর লাশ আছে, বাইরের লোকজন যেন জানতে না পারে। জানলেই সর্বনাশ।'
ভাইজানের কথায় খুব একটা লাভ হচ্ছে না। ছোট বোনটা বারবার হেঁচকি তুলছে। কান্না থামানোর জন্য সে কি প্রাণান্ড় কর চেষ্টা তার !
মা কাঁদছেন। বড় ভাইয়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই, 'ক্যান গেলা? কী কারণে গেলা? কই গেলা?' এসব অগোছাল প্রশ্ন করে যাচ্ছেন মৃত বাবাকে উদ্দেশ করে। অধিক শোকেই মনে হয় কিছুটা অস্বাভাবিক আচরণ করছে সবাই।
বাইরে যাতে আওয়াজ না যায় তাই কেবিনের দরজা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে চালু করা হয়েছে টেলিভিশনটা। সেখানে হিন্দি সিনেমার গান বাজছে। গোবিন্দ নামের এক খর্বকায় অভিনেতা গেয়ে যাচ্ছে, 'আখিয়োছে গুলি-মারো..লেরকি কামাল কা।'
কান্না থামিয়ে আমেনা বের হয়ে এলো কেবিনের বাইরে। কানে এসে লাগল বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। বৃষ্টি হচ্ছে খুব। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে লঞ্চের গায়ে। দুলছে লঞ্চটা।
লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়াতেই বৃষ্টির ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিল আমেনাকে। সে এসব নিয়ে ভাবল না। রাতের দূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আঁধারের শূন্যতাকে ঈশ্বর ঠাওরে মনে মনে শুধু বারবার বলতে লাগল, 'হে দয়ার সাগর, তুমি আমাদের রক্ষা করো। সর্বশক্তিমান, এ বিপদ থেকে যেন রক্ষা পায় আমার বাবা।'
ভিজে যাচ্ছে আবার আমেনার চোখ। তবে এখন কাঁদার জন্য রাখঢাক না রাখলেও চলবে। এই বৃষ্টিতে সবাই যার যার কেবিনে ঢুকে দিয়েছে ঘুম। আশপাশের কোথাও মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তেমন একটা। শুধু তাদের পাশের কেবিনে ওঠা এক দম্পতি একজন আরেকজনের কোমর জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা দূরে।
তাদের মধ্যকার ঝগড়া, আহ্লাদ, অভিমানের গুটিকতক আপত্তিকর শব্দ কানে এলেও আমেনা এসব উপেক্ষা করে ভাবতে লাগল মৃত বাবার কথা।
আজ দুপুরেও ঠিকঠাক ছিল লোকটা। পুরো এক গ্লাস দুধ পাউরুটি দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে কারো সাহায্য ছাড়া খেয়েছিল নিজে নিজেই। খাওয়া শেষে মায়ের সাথে মেতে উঠেছিল গল্পে।
মজা করে মাকে বলছিলেন, 'চন্দনা, তোমার যত বয়স বাড়ছে ততই সুন্দর হচ্ছ। দু-দুটো আইবুড়ো মেয়ে তোমার। এই বয়সে এত সুন্দর হওয়া ভালো না। বুঝলা?'
বিকেলের দিকে দু বোনকে ডেকে দোয়া পড়ে ফুঁ দিয়ে দিয়েছিল মাথায়। যাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়, যাতে টেকো জামাই না পায় এবং জীবনে সুখী হতে পারে এ জন্যেই মাথায় ফুঁ দিয়ে দোয়া করা।

এক সপ্তাহ ধরেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল লোকটার। তার সুস্থতা দেখে খুশি হয়ে উঠেছিল চিকিৎসকও। লিভার সিরোসিস থেকে মুক্তি নেই–এটা জেনে হাল ছেড়ে দেওয়া সবাই হয়ে উঠল আবার আশাবাদী।
বড় ভাইজান চিকিৎসককে অনুরোধ করে সুস্থ থাকা অবস্থায় রোগীকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইল। ঢাকায় এসে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল বাবা। বাড়ির জন্য খুব মন কাঁদত তার। রোগীকে নিয়ে খোশমেজাজে থাকা চিকিৎসকও কেন জানি আপত্তি করলেন না। তার কথামতো সবকিছু ঠিকঠাক করে মেনে করা হলো লঞ্চের কেবিনের টিকিট।
পারাবত, জলকপোত, দ্বীপরাজ–বরিশাল যাওয়ার এসব লঞ্চের কেবিন যেন এক একটা রাজকামরা। এসি, টেলিভিশন, আয়না, আলমারি, খাট আরামে থাকার সব কিছুই আছে এতে। তাই বাবাকে নিয়ে লঞ্চের কেবিনে করে বরিশাল যেতে দুশ্চিন্তায়ও ছিল না কেউই তেমন।
আজ সন্ধের দিকে ঝামেলা শুরু হয়। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর পুরো আকাশটা ঢেকে যায় কালো মেঘে। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছিল মেঘের গর্জন। এই আবহাওয়ায় না যাওয়াই উচিত–এমনটা ভেবে যাওয়া নিয়ে দোনামনো করছিলেন ভাইজান।
তবে বাবার উৎসাহ ও আনন্দ দেখে এসব আর ধোপে টিকল না।
সাড়ে ৮টার কিছু পরে মারা যান আমেনার বাবা। কেবিনের টেলিভিশনে একটা বাংলা নাটক দেখছিলেন তিনি। হাসির নাটক। হা হা, হো হো করে হেসে উঠছিলেন একটু পর পরই। হাসতে হাসতেই শুরু হয় শ্বাসকষ্ট ।
আমেনাকে তাড়াতাড়ি কাছে ডেকে বলে, 'মাগো, শ্বাস নিতে পারি না। দম বন্ধ হয়ে যায়। কেবিনের বাইরে নিয়া যা আমারে। বাইরে নিয়া যা।' কথাটা কোনো রকমে শেষ করতে না করতেই লুটিয়ে পড়েন তিনি বিছানায়। এক ন্যানো সেকেন্ডেরও কিছু কম সময় লাগে জীবিত থেকে পরিণত হতে মৃত মানুষে।
এরপর আসে আরেক বিপদ।
কেবিনে লাশ নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। লাশ নিতে হয় লঞ্চের ছাদে। কিন্তু এই বৃষ্টির ভেতর ছাদে লাশ নিতে দিতে নারাজ তিন ভাইবোন।
লঞ্চের লোকগুলো জানলেই শুরু হবে ঝামেলা। কোনো যুক্তি মানতে নারাজ এই গোঁয়ার লোকেরা। জোর করে তারা বৃষ্টির ভেতরেও লাশ যে ছাদে তুলবে তাতে সন্দেহ নেই কোনো।
আর তাই শোক লুকানোর চেষ্টা সবার। বুকভরা হাহাকার, কান্নাকে আড়াল করে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা।
বৃষ্টির বেগ বাড়তেই থাকে। বুড়ো হয় রাত। ভাবনার জগৎ থেকে ফেরে আমেনা।
একটু জোরে কান্নার আওয়াজ শুনে আবার যায় কেবিনের ভেতর। দেখতে পায় মাকে কাঁদতে নিষেধ করছে বোন আর বড় ভাইজান। বড় অসহায় লাগে তার।
সে অপেক্ষা করতে থাকে রাত শেষ হওয়ার জন্য। ভোর হলেই হবে হয়তো যন্ত্রণার অবসান। ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারবে আমেনা। পারবে হাউমাউ করে বিলাপ করতে কাঁদতে।

**৩.**

দুটো জোনাক পোকা উড়তে থাকে লঞ্চের করিডর ধরে। লঞ্চের বাইরে গেলেই বৃষ্টিতে ভিজে যাবে ডানা।
কপালটাই মন্দ তাদের। নইলে এমন ঝড়, বৃষ্টির রাতে কেউ কি আটকা পড়ে লঞ্চের ভেতর!
উড়ে উড়ে ফাঁকফোকরের ভেতর দিয়ে ঢুকে যায় লঞ্চের কেবিনগুলোতে। একটা কেবিনে ঢুকে শুনতে পায় মানুষের শীৎকার।
আলো নেভানো হলেও বুঝতে পারে আনন্দময় শীৎকারের কারণ।
মানুষ তাদের যতটা বোকা ভাবে ততটা বোকা তারা নয়।
কোন এক দম্পতির ভালোবাসায় আজই হয়তো ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলনে সৃষ্টি হবে কোনো ভ্রূণের। কোনো এক মানবশিশু হয়তোবা বছর ঘুরে আসবে পৃথিবীতে।
মন ভালো হয়ে যায় পোকা দুটোর।
তবে পাশের কেবিনে যেতেই আবার থমকে যেতে হয়। একটু পর পর সামান্য শব্দে কেঁদে উঠছে কারা যেন।
এখানেও নেভানো রয়েছে আলো। পোকা দুটো নিজেদের সামান্য আলো দিয়ে দেখতে পায় কয়েক জোড়া চোখ। ঘুমায়নি ঘরের কেউ। বাতি নিভিয়ে বালিশে মুখ চেপে কাঁদছে সবাই।

লাশটা চোখ এড়ায় না পোকা দুটোর।
কেবিনে লাশ রাখার কারণটা তাদের ছোট্ট মাথার অল্প বুদ্ধি দিয়ে বের করতে পারে না কেউই। তবে কষ্ট হয়। ভালো থাকা মনটা আবার হয়ে যায় খারাপ।
কষ্ট ভোলার জন্য পোকা দুটো করিডরে বের হয়ে উড়তে থাকে আবার।
কাছাকাছি বাজ পড়ে কোথাও। সৃষ্টিকর্তা আর প্রকৃতির নির্মমতা দেখে অস্থির লাগে জোনাক দুটোর। মৃত্যু আর জীবনের এমন পাশাপাশি বসবাস মেনে নেওয়াটা কঠিন।
তালগোল পাকিয়ে যায় সব। মাথাটা ঠিক করার জন্য উড়তে ইচ্ছে করে নদীর ওপর দিয়ে। ঝড়ো বাতাসের ভেতর দিয়ে। কিন্তু এমন পাগলামি করলে মৃত্যু নিশ্চিত।
মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দূরের আঁধারকে তাক করে নদীর ওপর দিয়ে উড়তে শুর" করে তারা হঠাৎই। ভিজলই না হয় ডানা। মরণই না হয় হলো আজ। অল্পদিনের জীবন তাদের।
বেঁচে থাকার জন্যই মাঝে মাঝে পাগলামিটা দরকার। খুব করে দরকার।

---o---

**তপোভঙ্গ**

---

---

রাজা শশীকান্তের মনটা ভালো নেই আজ। শরীরটার অবস্থাও যাচ্ছেতাই।
সে অল্প রোগী। কিছুই শান্তিমতো খেতে পারেন না। উল্টোপাল্টা খেলেই বুক হতে ঝাঁঝাল একটা ঢেকুর থেকে থেকে ওপরে গলার দিকে উঠতে থাকে। তা ছাড়া ঘুম ভাঙার পরই বুড়ো হাড়ে ব্যথা হয় খুব। যন্ত্রণা। বড়ই যন্ত্রণা।
পুব আকাশে মস্ড় একটা সূর্য উঠেছে। ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ।
এখন শ্রাবণ মাস। সূর্যের দেখা পাওয়া মুশকিল। আকাশের মনমেজাজও ঠিক নেই। এই বৃষ্টি তো, এই রোদ।
শশীকান্ত অন্দরমহল থেকে বের হন। ধূপের তীব্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পুজোর ঘর থেকে আসছে হয়তো। শশীকান্ড় ভৃত্য গোপাল পালকে খুঁজতে থাকেন। সকাল সকাল গোপালের নিজ হাতের তৈরি মন্ডা না খেলে তার মনটা ভরে না।
আজ মন্ডা তো দূরের কথা, একটু আঙুরের রস খেয়ে যে শান্তিমতো গানবাজনা করবেন তারও উপায় নেই।
শশীকান্তের গানবাজনার বড় শখ। খাঁটি মধু খেয়ে রোজ রেওয়াজ করা চাই। এতে কণ্ঠ সুমিষ্ট হয়। 'কইরে গোপাল, হারামি গেলি কই। আমার তামুকটা সেজে দে না বাপু।' জোর গলায় হাঁক ছাড়েন রাজা।
কারো সাড়াশব্দ নেই। গত রাতে নাচঘরে মেয়েটা মারা যাওয়ার পরই সবাই চুপচাপ। এমনটা তো হরহামেশাই ঘটে। এত শোক পালনের কী আছে বোঝেনা রাজা।
এবারের মেয়েটার বয়স একটু কম, এই যা সমস্যা।
শশীকান্ত বৈঠকখানার দিকে যেতে থাকেন। একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। হাজার হোক তিনি রাজা। প্রজাদের সুখদুঃখ না দেখলে তার চলে না।
শ্বেতপাথরে মোড়ানো মেঝেতে হাঁটতে হাঁটতে চারপাশটায় চোখ বুলাতে থাকেন তিনি। দার"ণ। দার"ণ সুন্দর সব। কাঠের নাচমহল, দেয়ালে আঁকা অসংখ্য ছবি, সিন্দুকঘর, ঘোড়াশাল–সব মন ভালো করে দেয়। নিজের শক্তি, ধনসম্পদের কথা ভাবতে ভালোই লাগে ।
বৃহত্তর নালপাহাড়িয়ার অর্ধেকটার মালিক সে। নদীয়ার ঠিক পাশেই জায়গাটা। তিনি স্বাধীন রাজা। ধনসম্পদের কমতি নেই তার। বিবিও আছে ডজনখানেক। বারো থেকে শুরু করে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত তাদের বয়স। বিবিদের জন্য আছে আলাদা মহল। এলাহি কারবার।

নালপাহাড়িয়ার নৃপতিকে বারোজন জমিদার কর দিতে বাধ্য। দু-একটা দুঃখের ঘটনা বাদ দিলে বলা যায়, বড় সুখেই আছেন শশীকান্ত।

বৈঠকখানায় আসতেই দেখতে পাওয়া যায় রাজপন্ডিত নিত্যনারায়ণকে।

কি যেন মুখে দিয়ে ছাগলের মতোন জাবর কাটছে সে। সুপুরিটুপুরি হবে হয়তো। এই লোকের যখন তখন সুপুরি খাবার বদঅভ্যাস। দূর থেকে শশীকান্তকে দেখেই ছুটে আসে নিত্যনারায়ণ ।

-পেন্নাম হই রাজামশায়। গায়ের অবস্থা ভালো ঠেকছে না গো। আওরাতের বয়স বড়ই কম ছিল। তা গত রাতে কী হয়েছিল?

-ন্যাকা সেজো না হে। কই থেকে ঘেঁটেঘুঁটে এমন রোগাটে জিনিস নিয়ে আসো কে জানে। গোপালকে দেখছি না সকাল হতে। তুমি বাপু আমার তামাকটা সেজে দাও দেকিনি।

পন্ডিতের ওপর বিরক্ত হয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলে শশীকান্ড়।

তিনি রাজা মানুষ। এভাবে রাজ্যির প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য শশীকান্ড় বাধ্য নন। প্রজাদের আস্পর্ধা দেখে তার অবাক লাগে।

নিত্যনারায়ণ মুখে পোরা সুপুরির গোলাটা কোঁৎ করে গিলে রাজার সাথে আবার কথা বলা শুরু করে।

-বেয়াদপির জন্য ক্ষমা করবেন মশায়, বলছিলাম কি গোপালের জন্য অপেক্ষা করলে ভালো হতো না। তামুক সাজার কাজে আমি বড়ই আনাড়ি।

'হারামির বাচ্চা' বলে মনে মনে রাজপন্ডিতকে একটা গালি দেয় শশীকান্ত। মুখে কিছু বলে না।

নিত্য তার বাবার আমলের লোক। বয়সী লোকদের গালিগালাজ করা শশীকান্তের ধাঁতে নেই। তা ছাড়া এই অশোভন বিষয়টিতে নাকি কর্কশ হয়ে ওঠে কণ্ঠ । তিনি গানের লোক। কণ্ঠের দিকে তাঁকে সদা নজর রাখতে হয়।

শশীকান্তের বয়সও কম হয়নি। পঞ্চাশের কোঠা ছুঁয়েছে, তাও সে বছর পাঁচেক আগে। তার চেহারা সুরত বড় ভালো। নাকের অল্প নিচেই পেল-ায় গোঁফ। রাজার মতোনই দশাসই চেহারা। দৈর্ঘ্যে তাকে ছাড়িয়ে যাবে এমন কেউ নেই এ তল-াটে। আখাম্বা পা দুখানি ধুতি দিয়ে কোনো রকমে পেঁচিয়ে যখন তিনি বের হন রাজ্যদর্শনে,তখন তা প্রজাদের কাছে একটা দেখার মতোন বিষয় হয় বটে।

অসুবিধে শুধু চুল নিয়ে। তার মাথায় চুল নেই তেমন একটা। সেই তো ঘাড়ের কাছে গোটা পঁয়ত্রিশেক চুল এলোমেলোভাবে গড়িয়ে পড়ে আছে কোনো রকম। তাও বেশিদিন টিকবে বলে মনে হয় না।

গায়কদের চুল না থাকা বড়ই লজ্জার বিষয়। শশীকান্ড় রাজা হলেও মনেপ্রাণে নিজেকে একজন সাচ্চা গায়ক ভাবতে ভালোবাসেন। এই সামান্য চুল নিয়ে তাই তো যত্ন-আত্তির শেষ নেই।

রাজ্যের কবিরাজ, বদ্যি সবাই তার মাথায় চুল ওঠানো নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিজেদেরই চুল খুইয়ে প্রায় সর্বস্বান্ড়।

জড়িবুটি, বুনো লতাপাতার রস সেবন, মাথায় শিমুল পাতা বেটে লাগিয়ে রাখা–কোনো চিকিৎসাই বাদ রাখেননি শশীকান্ত।

বৈঠকখানার পাশেই গোপালের জন্য দোচালার ঘর তুলে দিয়েছেন রাজা। যাওয়া হয়নি কখনো। রাজা হয়ে ভৃত্যের বাড়িতে ঢুঁ মারাটা বড্ড লজ্জার একটা বিষয়। তবুও ওমুখো একবার হবেন কি না ভাবল শশীকান্ত।

নিত্যনারায়ণ এখনো পাশে দাঁড়িয়ে সুপুরি চিবোচ্ছে। ব্যাটা ছাগল। মেজাজ খারাপ হতে থাকে রাজার। তার চারপাশে বড় বেশি মূর্খ মানুষদের বাস।

-রাজ জ্যোতিষী কোথায় জানো হে?

-সে তো দুপুরের আগে এমুখো হন না তেমন একটা। নতুন নাতি হয়েছে। সেই নাতি নিয়েই মেতে থাকেন দিনভর।

-এত কথা তো তোমায় জিজ্ঞেস করিনি। শরীরটা ভালো মনে হচ্ছে না। গত রাতে বড্ড ধকল গেল। এমনটা হবে জানলে কাল নাচঘরে যেতামই না।

-তা গোপালকে একটু বলতেন সাবধান করি দিতে। ব্যাটা খচ্চরের খচ্চর।

-গোপালের আর দোষ কি। মিইয়া মানুষের মন বোঝা দায়। তা সে দশের হোক বা একশত।

-খাঁটি কথা। খাঁটি কথা রাজামশায়। আমি রাজপন্ডিত মানুষ। কত বিদ্যে আমার! কই আমার মাথায় তো এসব আসে না। পেন্নাম হই। পেন্নাম।

-মশকারা করছ নাকি হে।

-রাজা শশীকান্তের সাথে মশকারা করার সাহস কী আর আমার আছে! তা হঠাৎ রাজজ্যোতিষীকে তলব করা কেন বললেন না যে।

-তুমি তো দেখি আস্ড় মূর্খ। রাজকুমারদের কী শেখাচ্ছ কে জানে। বললাম, না শরীর ভালো নেই। আয়ুরেখাটা একটু দেখার দরকার ছিল। শনির আছরটাচর পড়লে তো সর্বনাশ !

-সে হবিনে। সে হবিনে। রাজার আয়ু বলে কথা! হাঁটতে হাঁটতে গোপালের বাড়ি চলে এসেছি রাজামশায়। একটু কি খোঁজ নেব?

কথা বলতে বলতে এখানে চলে আসা হবে বোঝেনি শশীকান্ত। হাঁটাচলা তিনি মেপে মেপে করেন। আজ বড় অনিয়ম হয়ে যাচ্ছে।

রাজার আদেশের অপেক্ষা না করে গোপালের বাড়ি তাক করে রানু-ও রানু বলে ডাকতে থাকে নিত্যনারায়ণ।

এই রানুটা কে জানে না রাজা। জানা দরকার। প্রজাদের খোঁজখবর রাখা দরকার। এরপর থেকে হবে। ঘরে ঘরে গিয়ে প্রজাদের খোঁজ নেবেন তিনি। বেয়াদব প্রজারা আজকাল তাদের কন্যার কথা গোপন রাখছে। নিয়ম অনুযায়ী ঋতুবতী হলেই রাজার কাছে শুদ্ধ হওয়ার জন্য কন্যাসন্তানকে পাঠানোর নিয়ম।

সেসব মানছে না আজকাল অনেকেই। শাস্তি হবে। কঠোর শাস্তি।

অবশেষে রানুকে দেখা হয়। গোপালের একমাত্র মেয়ে।

বিয়ে হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি। স্বামী নিয়ে বাবার কাছেই থাকে।

-এতো দেরি হলো ক্যানো রে? সামান্য রেগে কথাগুলো বলেন নিত্যনারায়ণ।

-উনুনে আনাজ রেখে আসতে পারি না যে। আর দুটো মিষ্টি আলু সেদ্ধ করতে দিয়েছি। বাপজান এসে খাবেন। পেন্নাম-পেন্নাম।

সামনে দাঁড়ানো রাজা এবং রাজপন্ডিত দুজনকেই ঝুঁকে প্রণাম করে রানু। রাজাকে এত কাছ থেকে এই তার প্রথম দেখা। তাই চোখের অবাক দৃষ্টিটা সহজেই চোখে পড়ে যায় রাজা শশীকান্তের।

-আহা রে। বাপদরদি মেয়ে! তা তোর বাবা কোথায় বল দিকিনি?

-চান করতে গিয়েছেন দক্ষিণের পুকুরে। গত রাতে মারা যাওয়া মেয়েটার সৎকারের কাজ করতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গিয়েচে আজ।

-অ। বুঝলাম। রাজা এয়েচে। বাপকে ডেকে আন্ যা। মেয়েটাকে আদেশের সুরে বলে নিত্যনারায়ণ।

গোপালকে আর ডেকে আনতে হয় না। রাজার পেছন থেকে হুট করে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে গোপাল। কখন যে ভূতের মতোন পেছন থেকে এসে সে হাজির হয়েছে খেয়ালই করেনি কেউ। শশীকান্ড় এতক্ষণ চুপ করে ছিল। যতটা সম্ভব গোপালের ওপর রাগটা চেপে এইবার কথা বলল সে।

-আমার জলখাবারের কথা কে মনে রাখবে শুনি?

-মাপ করবেন রাজামশায়। আপনিই সব। ভুল হয়ে গিয়েচে। গতকাল রাতে মেয়েটা ফাঁস নেবার পর বড় ঝক্কি গেল। বয়স তো কম। মাত্তর সাড়ে নয়।

-তা এই জিনিস পাঠিয়েছিলি ক্যানো? দোষ বুঝি সব আমার? ফাঁস নেবে বুঝলি না ক্যান? এসব কাজের সময় তুই তো ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকিস বরাবর।

-কাল একটু নেশাটা বেশি হয়েছিল যে।

-অই শোনো। উনি নেশা করেচেন আর দোষ দিচ্ছেন রাজাকে। শালা খচ্চরের খচ্চর। সুযোগ পেয়ে এবার একটু কথা বলে নিত্যনারায়ণ।

-তুমি চুপ করো হে। ধমক দেন রাজা।

গোপাল কাঁপতে থাকে ভয়ে। রানু মেয়েটার কচিমুখও শুকিয়ে আমসি।

শশীকান্ত এখন আর গলা চড়াবেন না বলে মনে মনে ঠিক করেন। এতে কণ্ঠের ক্ষতি। কিন্তু রাগ কি আর কারো কথা শোনে !

শশীকান্ত  জোর পা ফেলে অন্দরমহলের দিকে যেতে থাকেন। পেছন পেছন আসতে থাকে নিত্যনারায়ণ আর গোপাল। সূর্যের আলোর তেজ বেড়েছে। গাছের পাতায় পাতায় খেলা করছে হলুদ রোদ।

রাজাকে সম্মান জানানোর জন্যই যেন গাছের পাতার আড়ালে থাকা একঝাঁক পাখি উড়ে যায় আকাশে। উড়তে উড়তে দেখাতে থাকে নানা কারসাজি।

আজ আর বৃষ্টি হবে না রাজজ্যোতিষী ছাড়াই বুঝতে পারেন নালপাহাড়িয়ার প্রতাপশালী রাজা শশীকান্ত। তাই বৃষ্টি নিয়ে মজা করে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে বসেন।

একটু পরই হাঁটার গতি কমে তার। ঠিক গা ঘেষে এসে দাঁড়ায় নিত্যনারায়ণ আর গোপাল। মন ভালো ভাব নিয়ে রাজা গোপালের দিকে তাকান। চোখে প্রশয়।

‘আজ আর নতুন কারো দরকার নেই। তোর মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিস হে। শেষ বয়সের মেয়ে তোর। বড় ভালো আর আদরের মেয়ে। বোঝা যায়। বোঝা যায়। যা এখন আমার জলখাবারের ব্যবস্থা কর গিয়ে।’ কথাগুলো বলে একবারও

পেছনে না তাকিয়ে দ্রুত অন্দরমহলের দিকে চলে যান শশীকান্ত। জলখাবারের বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ। তাই এই তাড়াহুড়ো।
গোপাল আর নিত্যনারায়ণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। রাজা যদি একবারও পেছনে ফিরে তাকাতেন, তবে দেখতেন গোপালের চোখে জল। এ জল যতটা না কন্যার, তার চেয়েও ঢের বেশি রাজা শশীকান্ড়ের জন্য।
সেই ছোট থেকে মানুষ করেছেন। নিজের সন্তানের মতো বলেই রাজাকে মাঝে মাঝে ডাকেন বাবা বলে। শশীকান্তও কোনো কিছুই গোপন করে না তার কাছে। গোপাল তার সবচেয়ে কাছের লোক।
বড্ড আফসোস হয়। একবার যদি আয়ুরেখাটা দেখত আজ শশীকান্ত, তবে হয়তো বেঁচে যেত সে। নাচঘরে মেয়েদের নগ্ন হয়ে ঢোকার নিয়ম। সাথে যাতে না থাকে কোন হাতিয়ার, তাই এ ব্যবস্থা। কিন্তু গোপাল থাকবে দরজার আড়ালে।
প্রচন্ড যন্ত্রণা নিয়েও এতগুলো বছর অনেক সহ্য করেছে। আর নয়। তা ছাড়া নিজের মেয়ে বলে কথা ! তাই হয়তো হাত কাঁপবে না একটুও তার।
সাথে লুকিয়ে থাকা বহুদিনের পুরনো ছুরিটা দিয়ে রাজা শশীকান্তের কণ্ঠনালিটা কাটার সময় বড় কষ্ট হবে গোপালের। দমক দমক রক্ত ফ্যাসফ্যাস শব্দ করে যখন বের হবে শশীকান্তের কণ্ঠ থেকে তখন রাজার গান গাওয়ার শখের কথা মনে পড়বে খুব।
গোপালের আজ শোকের দিন। পুরো নালপাহাড়িয়ার মানুষের শোকের দিন।
এই দিনে তারা রাজা হারাবে।
রাজার মনে মনে করা ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণিত করে বৃষ্টি শুরু হয়। শ্রাবণের জোর বৃষ্টি। সেই সাথে বাতাসের পাগলামি। আচমকা কালো কালো মেঘেরা অন্ধকার করে ফ্যালে চারপাশ। পাখিরা পাতার আড়ালে এসে নিজেদের ছোট্ট শরীরটাকে লুকিয়ে নেয় দ্রুত।
রাজজ্যোতিষী বলেছেন, মৃত্যুর খবর পাখিরা সবার আগে পায়। কথাটাকে সত্যি মনে হয়। অন্তত আজ পাখিদের আচরণ দেখার পর বোঝা যায় কথাটা মিথ্যে হওয়ার জো নেই। একদমই নেই।

---o---

## উপাসনা

---

---

**অবতরণিকা**

কথা ছিল ভোরে কুয়াশায় ঢেকে যাবে চারপাশ। তীব্র শীতে তারা চড়াও হবে গাছ, পাতা, ঘাস এমনকি মানুষের চোখের পাতার ওপরও।
হয়নি।
শীত নিয়ম ভেঙে আকাশ হতে সকাল সকাল উপুড় করে ঢালল রোদ। কঠিন রোদ। শীতের কাপড় আর পরল না সেদিন কেউই।
কুমারখালী নদীতে জোয়ার উঠল। সোনালি রোদে চিকচিক করা জলে তড়িঘড়ি করে নৌকা নিয়ে নেমে পড়ল মাঝিরা। পাড়ে গজিয়ে ওঠা কাশবন গত রাতের ভেজা শরীর শুকোতে লাগল রোদে। আর গুটিকয়েক ধূসর সাদা রঙের বক নিজের শরীরের রঙের সুযোগ নিয়ে লুকোচুরি খেলতে লাগল সেই বনেরই ভেতরে।
ওদের কান্ড দেখে চোখে ধাঁধা লাগে। নৌকা পারাপারের সময় যাত্রীরা ওদের আলাদা করে ঠাওর করার চেষ্টা করে। সময় কাটানোর জন্য এমন ধাঁধার সমাধান করাটা দারুণ প্রাচীন এক খেলা।

বেলা বাড়তে থাকে। বকগুলোর খেলা শেষ হয় একসময়। কেউ কেউ চলে যায় শিকারে। দলবেঁধে কিংবা একা। সবাই চলে যাবার পরও একটা বুড়ো বক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বনের ভেতর। তাকায় ইতিউতি।
নিজেকে নিয়ে হয়তো এ মুহূর্তে বিভ্রান্ড় কিছুটা সে। বেলা বাড়ে আরো। সূর্যের আলোর তেজ সাংঘাতিক আজ। বকটা একটা সময় আকাশে উড়াল দেয়। বুড়ো ডানায় ভর করে উঠে যায় অনেকটা ওপরে। অনেক অনেক। এই বয়সেও তার ডানার জোর দেখে অবাক হতে হয় !
কুমারখালী নদীর চারপাশের আকাশ বড় সুন্দর। শুধু আকাশই নয়, যে গ্রামটি সাপের মতোন শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আছে সে, সেই গ্রামটি এবং গ্রামের নামটিও সুন্দর। গ্রামের নাম চন্দ্রপহর। নামকরণের পেছনে গল্প আছে অনেক। আজগুবি হলেও মন্দ নয় সেগুলো শুনতে।
বকটা একটানা ওড়ার পর ক্লান্ড় হয় একটু। চন্দ্রপহর গ্রামের বাজার লাগোয়া সবচেয়ে উঁচু গাছটার একটা ডালে গিয়ে বসে।
একটু জিরিয়ে নিতে হবে। কেন যেন মনে হয় হুঁশ লোপ পেয়েছে আজ তার। মাথাটা ঝিমঝিম করে। মানুষের বড্ড কাছাকাছি চলে এসেছে আজ বকটা। এটা বিপজ্জনক। মানুষ বড্ড খারাপ। বড্ড লোভী।
বাজারের সবাই ব্যস্ড় খুব আজ। বুড়ো বকের এমন কা"কারখানা চোখে পড়ে না তাই কারো।
মন বলে কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে বকের। আজ উচাটন হয়েছে তার মন। মনে পড়ছে পুরনো সব স্মৃতি। হারিয়ে যাওয়া ছানাপোনাগুলো আর প্রজনন মৌসুমে জোড়ায় জোড়ায় ভালোবাসা হওয়ার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।
ফুরিয়ে এসেছে আয়ু। ছানাগুলো বড় হয়ে ছেড়ে চলে গেছে তাকে। বুড়ো শরীরে কিছুই ভালো লাগে না এখন আর। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করাই একমাত্র কাজ।
বাজারে মানুষের জটলা বেড়ে যায় হঠাৎ করে। কানে আসে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। জরি আর রঙিন কাপড়ের তৈরি উদ্ভট পোশাক পরে বাজনা বাজায় একদল লোক। তাদের ঘিরে নারী, পুরুষ আর উলঙ্গ শিশুর দল নাচতে থাকে।
এলাকার প্রতাপশালী মেম্বারের মেয়ের বিয়ে। এলাহি আয়োজন। গানবাজনা আর খাওয়াদাওয়ায় জমজমাট চারদিক। লোকজনের ব্যস্ড়তা দেখে বকটা সাহস পায়। নেমে আসে অনেক নিচে। বাজারের একমাত্র সেলুন 'টিপটপ কাটিং'-এর জং ধরা টিনের চালে গিয়ে বসা হয় এবার।
দোকানের ভেতর লোকজন তেমন নেই। মালিক নিতাই ফুলবাবু সেজে গিয়েছে বিয়ে খেতে। ফার্স্ট ব্যাচে খাওয়া তার চাই-ই চাই।
সেলুন হতে নিতাইয়ের আয়রোজগার মন্দ হয় না। বাজারের একমাত্র সেলুন বলে লোকজনকে আসতেই হয়। সেলুনের রোজগারে ছেলেকে ঢাকায় পড়াচ্ছে নিতাই। মেয়েটাকেও বিয়ে দিয়েছে কিছুদিন হলো।
মানুষ হিসেবে নিতাই তেমন একটা সুবিধার না। আয়রোজগার ভালো হলেও দোকানটার অবস্থা করুণ। দুটো ঝাপসা আয়না আর নড়বড়ে দুটো চেয়ার রয়েছে দোকানে। দেয়ালজুড়ে বাংলা ছবির নায়িকাদের রঙিন ছবি। নিতাই বেছে বেছে মোটামুটি অশ্লীল কয়েকটি ছবি সেঁটে দিয়েছে দেয়ালে। খদ্দের টানতে এগুলো কাজে দেয়।
দোকানের কর্মচারী দুজন। নিতাই আর ধানী। ধানী নিরীহ, বোকা মানুষ। বয়স হয়েছে অনেক। নিঃসন্তান। আপন বলতে নেই কেউই। চোখে পড়েছে ছানি। শরীর হয়েছে নড়বড়ে। হাঁটতে কষ্ট হয়। তবে হাত দুটো এখনো সচল। চুল, দাড়ি, বগলের পশম কাটা, মাথা ও শরীর ম্যাসাজে সে এতটাই পাকা যে চোখে ভালোমতো না দেখলেও চলে।
তবুও ধানীর বড়ই দুঃখ। গরিবেরও গরিব সে। মালিক নিতাই আয়ের সামান্য অংশই তুলে দেয় তার হাতে। সে টাকায় তিনবেলা ডাল-ভাত খেয়ে চলাই মুশকিল। থাকে নিতাইয়ের বাড়িতে গোয়ালঘরের পাশে ছোট্ট একটু জায়গায়।
নিতাইয়ের মুখ খারাপ। কাজে সামান্য ভুল হলেই করে গালিগালাজ। বুড়ো বলে ছাড় পায় না ধানী একটুও। বুড়ো বয়সে আর কিছু করার সাধ্যি নেই বলে মুখ বুজে সহ্য করে সব। ইস্, একটা ছেলে যদি থাকত তার ! ব্যাটা, রোজগাড় করে খাওয়াত এই বয়সে।
দোকানে খদ্দের নেই এখন। আসবে বলেও মনে হচ্ছে না। মেম্বারের মেয়ের বিয়েতে গিয়েছে সবাই। বিনে পয়সায় এমন খানাদানার আয়োজন খুব শিগগিরই আর হবে বলে মনে হয় না। অনেক দিন মাংস খাওয়া হয় না। গোশত, পোলাও এসব খাওয়ার বড় শখ হয় নিতাইয়ের। সে ভগবানকে বড় মানে। ভগবান লোভ করতে নিষেধ করেছেন।
ধানী খাওয়ার লোভ সামলাতে পারে না। মাংস খেতে ইচ্ছে করে। খাওয়াদাওয়া উপাসনার মতোন। ধানী খেতে বড়ই ভালোবাসে। প্রতিদিন এক মোটা চালের লালচে ভাত আর কলুই শাক খেতে ভালো লাগে না তার। আমিষের জন্য মন বড় আনচান করে। কান্না পায়। বেছে বেছে ভগবান এই খানাপাগল লোকটাকেই গরিব বানাল !

ভগবানের ওপর রাগ করতে নেই। শেষ কবে আমিষের স্বাদ পেয়েছিল মনে করতে পারে না এই বুড়ো লোকটি। দোকানের ভাঙা চেয়ারে বসে অশ্লীল ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে ধানী। এসবের দিকে মন নেই তার। তাকিয়ে থাকার জন্য তাকিয়ে থাকা। ভগবানের দিব্যি দিয়ে সে লোভ ভুলে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্ষুধার্ত শরীরে মাথায় অন্য কোনো ভাবনা আসে না। নিতাই তাকে দোকান ছেড়ে নড়তে নিষেধ করেছে। বিয়ে খাওয়ার ভাগ্যি তার কপালে নেই। নিতাইয়ের গালির ভয় নেই তার, তবে চাকরিটা হারানোর ভয়টা আছে। শেষ জীবনে এটাই এখন একমাত্র আশ্রয়। এই আশ্রয় হারালে চলবে না। খিদেতে ঘুম চলে আসে। মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। টিনের চালের ওপর তেরছাভাবে পড়া রোদটা চোখে এসে লাগে। চোখের ছানি আর খিদের কারণে কাছেই থাকা একটা বুড়ো বককে দেখতে পায় না সে। বকটা নেমে এসেছে দোকানের কাছাকাছি। বুড়ো বক পুরনো ঋণ শোধ করতে চায়।

বহুদিন আগে একবার ফাঁদে আটকা পড়েছিল সে। বাঁচার জন্য সে কী করুণ আহাজারি করছিল সেদিন ! ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল ডানা।

এই লোকটা বাঁচিয়েছিল সে সময় তাকে। সব মনে আছে। পুরনো সব কথা মনে পড়ছে তার। ভালোমতোই লোপ পেয়েছে মনে হয় হুঁশ। কিছু একটা করতে চায় সে লোকটার জন্য। মরে যখন যেতেই হবে ঋণ শোধের সুযোগটা কাজে লাগালে মন্দ কি!

পিছুটান নেই তো আর কোন। ধানীর আমিষ দরকার। এগিয়ে যায় বুড়ো বক। ধানীর কাছাকাছি। একদম কাছাকাছি। ডানার ঝাপটায় জেগে যায় ধানী। চারপাশের ব্যাপারটা একটু বুঝে নিয়েই চেপে ধরে বকটার গলা। নিঃশ্বাস নিতে বড় কষ্ট হয় বুড়ো বকের। কষ্ট হয়।

তবুও শান্ড়ি। বড় শান্ড়ি। হোক না আত্মহত্যার মতোন কাজ, তবুও ঋণ শোধের মতোন এমন আনন্দ কজনই বা পায়?

<u>সমাপনী</u>

রাত হতেই বেড়েছে শীতটা। ঝিঁঝি পোকারা ডেকে যাচ্ছে সমানে। থেকে থেকে একটু পর পর শোনা যাচ্ছে শেয়ালের ডাক। চন্দ্রপহর গ্রামের একটি বাড়ির উঠোনে নিভু নিভু কুপির আলোতে খেতে বসেছে ধানী নামের এক বুড়ো লোক। লোভে, আনন্দে চোখ চকচক করছে তার।

বাড়ির মালিক নিতাইয়ের পরিবার রান্নার পরে বকের মাংস অতিসামান্যই তুলে দিয়েছে তার পাতে। সে নিয়ে ক্ষোভ নেই ধানীর। সে খাচ্ছে। বড় আনন্দে। কুড়মুড় করে চিবোচ্ছে হাড়।

দুর্বল দাতের ফাঁকে মাঝে মাঝে আটকে পড়া মাংসেরও রেহাই নেই। আঙুল দিয়ে টেনে চালান করে দিচ্ছে পেটের ভেতর। আহা, খাওয়াই তো ভগবান। আমিষের উপাসনাই ধর্ম। খেতে খেতে চোখ বুজে আসে ধানীর। আমিষের সুখ। বুড়ো বকের ঋণ শোধের ব্যাপারটাও নিমিষে ভুলিয়ে দিতে পারে এই সুখ। ভুলিয়ে দিতে পারে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মকর্মের কথা। এমনই ক্ষমতা তার...।

---o---

## কাঁচা ধানের কবর

---

---

দুপুরটা ভালোমতো জেঁকে বসতে না বসতেই চারপাশটা আঁধারে ঢেকে যায় এখন।

বর্ষাকালের এই এক যন্ত্রণা। দুপুর আর রাতের মাঝখান থেকে সন্ধে আর বিকেলটাকে আলাদা করে ঠাওর করা যায় না। দোনামনো করে আসা অল্প কিছুক্ষণের এক বিষণ্ন ভোরের দেখা মিলতে না মিলতেই চলে আসে দুপুর। সে দুপুর বড্ড নিরীহ। তাতে নেই সূর্যের আলোর তেজ, নেই পথিকের গলায় পিপাসা জাগানোর শক্তি।

এর পরই আকাশ ভারী হয়ে উঠে অসংখ্য মন খারাপ করা কালো কালো মেঘে। আলোর দেখা পাওয়া তখন মুশকিল।

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির সাথে ঝড়ো হাওয়া শুরু হয় প্রথমে। সময়ের সাথে পাল-া দিয়ে বাড়তে থাকে বৃষ্টির বেগ।
বর্ষা-বাদলায় জনতার হাটে মানুষের ভিড় বড্ড কম হয়। ঝিম মেরে বসে থাকে দোকানদাররা। কেউ কেউ চা আর হাওয়া বিস্কুট খেতে খেতে তাসের আসর জমিয়ে তোলে।
আলমের এসব ভালো লাগে না। সে দোকানে বসে বৃষ্টিস্নাত বাইরের আকাশ দেখে সময় কাটায়। বৃষ্টির পাগলামি, লুটোপুটি বড্ড ভালো লাগে তার।
একটু পর পর দু-একটা নছিমন আর ভটভটি হাটে আসলে লোকজনের সমাগম হয়। তখন বিক্রিবাট্টার জন্য দোকানদাররা তৈরি হয়।
আলমের এসবে তাড়া নেই। তার দোকানে বিক্রি হয় টিন। তাই সবই বাঁধা খদ্দের। দোকানে তেমন একটা কাজ থাকে না। চৌপর দিন বসে শুধু ক্যাশবাক্সের ওপর নজর রাখতে হয়। আলম তাই ঝিমোয়। ঘুম জেগে থাকা আর ঝিমানো এর মাঝেই বন্দি হয়ে গেছে তার আটপৌরে জীবন।
বৃষ্টিটা ভালোই জমে উঠেছে। বাতাসের বেগ প্রচন্ড। ঝড় না হয় আবার! বৃষ্টির ছাঁট আসছে দোকানের ভেতরও। বাতাসের তোড়ে বেসামাল হয়ে উঠছে পরনের লুঙ্গি।
একটু ঠিকঠাক হয়ে বসে জানালা লাগোয়া পেঁপেগাছটার বৃষ্টির জলে ভেজা দেখতে দেখতে মুড়ি আর গুড় চিবোয় আলম। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। ঝিমুনির সাথে খাওয়া আর এই বৃষ্টিটা বড্ড ভালো লেগে যায়। চিবানো বন্ধ করে আলম গান ধরে আচমকা। এলোমেলো সুরে কর্কশ কণ্ঠে গেয়ে ওঠে–

'আমার আসমান ভাঙে, জমিন ভাঙে,
মরা নদীর শীতল গাঙে,
বুকের ভেতর ভাঙা ডানার চলে দাপাদাপি।'

-ও আলম, যাইবি না বাড়ি?
ডাক শুনে গান থেমে যায় আলমের। জানালা দিয়ে দেখতে পায় মুদি দোকানদার সুলতানকে। সুলতান আলমের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও তাকে নাম ধরে ডাকে। আলম কিছু মনে করে না এতে। তার মতোন অসহায়, বোকাসোকা মানুষকে যে কেউই নাম ধরে ডাকতে পারে। এতে অপরাধ নেই। হয়তো কোনো একদিন তার বড় ছেলেটাও বাপকে ডেকে বলবে, 'আলমরে, বাজার থোন একখান লাল জামা আইনো।'
এসব ভেবে আলমের দুঃখ হয়। দুঃখ হয় নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে, পৌরুষত্বের অভাবের কথা ভেবে। বোকারা নাকি সুখে থাকে। কিন্তু আলমের বড়ই দুঃখ। সব কিছুতে দুঃখ।
-যামু তো। তুমি তো ভিইজা একসা মিয়া। জবাবে বলে আলম।
-আর কইনো না। এরলাই বৃষ্টি-বাদলা ভালা লাগে না। বাইর হইলেই শালা ভিজো আর প্যাক কাঁদায় পা ডুবাইয়া চলো। বাড়িত্ যাবা কি না কও। যাইতাছি আমি।
-অস্থির হও ক্যান। যামু তো। তয় বাজার সদাই যে আছিল কিছু।
এক গ্লাস পানি খেয়ে মুখের ভেতর লুকিয়ে থাকা মুড়ির অবশেষ গিলতে গিলতে বলে আলম। বৃষ্টিটা কমে এসেছে, তবে বাতাসের বেগ এখনো প্রচন্ড।
-আইজ বাদ দ্যাও। ঘুটঘুইটা আন্দার নামলে বাড়িত যাওন বিপদ। দিনকাল ভালো না।
দিনকালের ভয় পায় না আলম। কীই-বা আছে তার। তবে সুলতানের তাড়া দেখে ক্যাশবাক্স গুছিয়ে বাইরে আসে সে। দোকান নিয়ে ভয় নেই। কর্মচারীরা আরো কিছুক্ষণ থাকবে। তারপর দোকান বন্ধ করে যে যার বাড়ির পথ ধরবে।
কাদা বাঁচিয়ে হাঁটার চেষ্টা করে দুজন। শীতল বৃষ্টির জলে একটু পর পর কেঁপে ওঠে শরীর। আলো কমে যাওয়ার কারণে আবছা হয়ে আসে দূরের সবকিছু। তার মাঝেই চোখে পড়ে কয়েকটা জলপিপি ডানা মেলে দিয়েছে উড়াল আকাশে।
আলম তাকিয়ে দ্যাখে কাছেই বাতাসের তোড়ে নুয়ে পড়েছে কাঁচা ধানের গাছ। এমন সবুজ চোখে পড়ে না সচরাচর। বৃষ্টির জলে ভিজে আরো বেশি সজীব হয়ে উঠেছে সব। মস্ত এক সবুজ বিছানা। চাষির প্রেম, ভালো লাগা, জীবন সব যেন ফুটে উঠেছে তাদের শরীরের পরতে পরতে।
এক সময় এ ধানের বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাটি, ধানের ঘ্রাণ নিয়েই কাটত আলমের সকাল, দুপুর ও বিকেল।
বাবার ছিল সামান্য চাষের জমি। তাই দিয়েই চলত সাতজনের বড় একটি পরিবার। উপোস থাকতে হতো প্রায়ই।
আলমের এসব নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। সে ভালো লাগলে খায়, নইলে খায় না।

বড্ড উদাসীন এই লোক। বাউল হওয়ার শখ ছিল। সুর আর কণ্ঠ কোনোটাই ঠিক না থাকায় মরে যায় সে ইচ্ছেটা একসময়। তবে মনের দিক থেকে সাচ্চা বাউল ভাবত আলম নিজেকে।
উপোস থাকার কষ্টটা সহজে ভোলা যেত না। কঙ্কালসার মা-টা কাঁদত খুব। কাঁদতে কাঁদতে মরেই গেল একদিন। গরিবের ঘরে একবার মরণ এলে থামানো মুশকিল। একে একে এরপর সবাই গেল।
বাইরের কারণটা রোগ-শোক হলেও ভেতরের কারণ মরণ খিদে। ছোট লোকদের খিদেটাও একটু বেশি বেশি।
আলমের জেদটা চাপে তখনই। রাগ হয় মরণের ওপর। রাগ হয় সাত আসমানেরও অনেক অনেক ওপরে থাকা ক্ষমতাবান একজনের ওপর।
তবুও প্রার্থনা করত সে। প্রতি সকালে চলে যেত বাড়ির কাছের পুকুরটায়। কচুপাতার ওপর কিছু ধান রেখে ভাসিয়ে দিত জলে।
বিশ্বাস ছিল তার এ ধান গ্রহণ করবে ক্ষমতাবান সেই একজন। উপহারে খুশি হয়ে ভরিয়ে দেবে বাবার ধানের গোলা।
ভুল সব। তিনি গ্রহণ করেননি কিছুই। জলের ওপর শুধুই এলোমেলোভাবে ভেসেছে প্রতিদিনকার ধান আর কচুপাতা।
বাঁচাতে পারেনি আলম কাউকে। মরে শেষ হয়েছে সব। সব।
বাপ, মা, ভাইবোনগুলো খিদের জ্বালা থেকে পেয়েছে মুক্তি। মন্দ নয় এটা। রাগ, অভিমান আর জেদের কারণেই আলম তাই সংসারী হয়েছে। কঠিন সংসারী।
-ধানটান যাইব এবার সব। যেমন দেহি তাতে মনে কয় ষোলআনা ধানের বারো আনাই নষ্ট হইব।
-যাউক। মর“ক গিয়া। আমার কী। আমি আমার দোহানডা বাড়াইতে পারলেই খুশি। হেরপর বিয়া কইরা সংসারী হমু। এসব চাষবাসের কাম পোষায় না আমার। আর ধান বেশি হইলেও যা দাম কম হইলেও এক। এই শালা বাটপার চাষাগো দুকখে-দুক্‌খো পাইয়া লাব নাই।
-হুম। সুলতানের কাছ থেকে এমন জবাব পেয়ে কথা আর বাড়াতে ইচ্ছে করে না আলমের। চুপ করে থাকে সে। মনটা বড় অস্থির আজ। এমন প্রায়ই হয়। উদাসীন হয়ে যায় সে। লোকে তাই বলে আলমের মাথায় গন্ডগোল আছে।
-গোস্‌সা করলা নাকি মিয়া? তুমি তো আবার চাষার জাত। কথাটা বলে খিকখিক করে হাসে সুলতান। তার খইনি খাওয়া ময়লা দাঁতগুলোর দিকে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নেয় আলম। মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠে যায়। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে কথা বলা শুরু করে।
-ফসলের তুমি কী বুঝবা মিয়া। ফসল হইল প্রাণ। রক্ত।
-চেতো ক্যান? হগলে কয় মাথার ব্যারাম আছে তোমার। কতাডা মিছা না। তুমি মিয়া পুরুষ হইলা না। পুরুষ মাইনষের এত মায়া কিসের? একটু বিরক্ত হয়ে বলে সুলতান। কপালের ভাঁজগুলো দেখে বোঝা যায় তা স্পষ্ট।
-না, চেতুম ক্যান। চেতি না। সত্তডাই কইলাম। তোমার কথা তুমি কইছ, আমি কইছি আমারডা।
-হুম। ডাইনে যামু আমি। থাহো তুমি তোমার ধান লইয়া।
-রাগ করলা?
-না। তুমারে চ্যাততে দেহি নাই আগে। ঝড় বাড়ব। যাও তুমি। তাড়াতাড়ি গিয়া ভাত চড়াইয়া দিমু। আমার তো আর বউ নাই।
সুলতানের কথাগুলো চুপচাপ শোনে আলম। বুঝতে পারে খেপেছে সুলতান। নইলে আরো কিছুক্ষণ থেকে বকবক করে মাথা ধরাত।
আলমকে ছেড়ে সুলতান অন্য পথ ধরে। প্যাক কাদার ওপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাওয়ায় প্যাচোর প্যাচ শব্দটা কানে বাজতে থাকে বিশ্রীভাবে। আলমের একটা বিড়ি ধরাতে ইচ্ছে করে। ধোঁয়ার জন্য নয়, বিড়ির আগায় জ্বলে থাকা আগুনটার জন্য। এ আগুনটা মাঝে মাঝে তার শরীর গরম করে।
যখনই পুরনো অতীত চারপাশ থেকে এসে তার মাথাটা পিষে ফেলতে চায় তখনই আলমের শরীর কাঁপতে থাকে শীতে। তখন প্রয়োজন হয় আগুনের। সবকিছু ছারখার করে দেওয়া আগুনের।
প্রজন্ড মাথাব্যথা আর শীতে কাবু হয়েও টলতে টলতে বাড়ির কাছাকাছি চলে আসে আলম। পাকের ঘরের (রান্নাঘর) পেছনে জংলামতো জায়গা। বুনো আগাছায় ভর্তি চারপাশটা।
পড়তি আলোর ভেতরেও আলম আবছা আবছা দ্যাখে চুলোর পাশে বসে তার সদ্য ন্যাড়া হওয়া ছেলেটা সর্দি মুছসে। বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে করে না একদমই। ইচ্ছে করে পালাতে। শেষবারের মতোন একবার বাউল হওয়ার চেষ্টা করতে। মাটির ঘ্রাণ নিয়ে মাটির গান করতে। কিন্তু সংসার, বাজারের দোকান, দুধেল গাই, দোচালা টিনের বাড়ি, খোপভর্তি মুরগি, বউ মরিয়ম, ছেলে খোকন আর ছোট্ট মেয়েটা যার নাম ঠিক করা হয়নি এখনো তাদের মুখগুলো ভেসে ওঠে মনে। মায়া এসে শিকল পরিয়ে দেয় পায়ে।

হঠাৎই ছোট মেয়েটার কান্নার শব্দ শুনতে পায় আলম। ডাক ছেড়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে মেয়েটো। ছোট্ট শরীরটায় কান্নার সে কী তেজ!
বড় মিষ্টি এ কান্নার আওয়াজ। বড় মায়া, বড় আদর এ কান্নায়। প্রবল সন্তান ক্ষুধায় শিকড় গজিয়ে যায় আলমের। তার উদাসীন হওয়া হয় না। বাড়ি ছেড়ে পালানো হয় রনা। আলম বাড়ির ভেতরে ঢোকে।
পাকের ঘরে জ্বলে থাকা ছোট্ট একটা কুপির আলোর শিখা কিশোরীর চোখের পলকের মতোন তিরতির করে কাঁপে। গাঢ় অন্ধকারের ভেতরেও সে সামান্য আলোয় চোখ ধাঁধায়।
মেয়েটার কান্না থেমেছে। মরিয়ম জেগে উঠে হয়তো মেয়েকে নিয়েছে কোলে। মুখে গুঁজে দিয়েছে স্তন। আকাশের অবস্থা ভালো না। বাড়ছে বাতাসের বেগ। ঝড় হবে বোঝা যায়। সব চাষির সর্বনাশ হবে। মাটিতে মিশবে কাঁচ ধান। কাঁচা ধানের শোকে, দুঃখে, কষ্টে বিবাগী হবে শত শত মানুষ।
এসব জেনেও আলমকে চুপচাপ থাকতে হবে। পোড়া এক সংসারের লোভ আর মায়ায় সে বিবাগী হতে পারবে না। পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে যায় আলমের। ভেবে ভেবে কান্না পায়। চোখের জল লুকাতে দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকে সে। ঠিক তখনই কড়াৎ করে বাজ পড়ে কাছাকাছি। ঝড় আসছে। কঠিন ঝড়...।

---o---

## কাঠের শরীর

---

---

ডুবটা দেওয়ার সময় বোঝা যায়নি এত দ্রুত নিঃশ্বাস শেষ হয়ে যাবে। হওয়ার কথাও না। জহর পাকা ডুবুরি। নিঃশ্বাস বন্ধ করে অনেকটা সময় সে থাকতে পারে জলের নিচে। তবে আজ এমন কেন হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না।
নিঃশ্বাস বেশিক্ষণ বন্ধ রাখা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ হলো চেষ্টা করে যাচ্ছে জহর। কাজ হচ্ছে না। মেজাজ খারাপ হয়। বুকভর্তি বাতাস নিয়ে সে চলে যায় জলের নিচে। কিন্তু জল তাকে গিলতে চায় না। দমে টান পড়লেই ভুস করে মাথা তুলতে হয়। জল তাকে ঠেলে দেয় ওপরের দিকে। আশপাশের ডুবুরিরা সবাই বিরক্ত তার ওপর। কাজের সময় এমন ঝামেলা পছন্দ নয় কারো।
রাত নেমেছে। সন্ধের আঁতুর ঘর থেকে বের হয়ে আকাশটার দখল নিতে আঁধারের সময় লাগেনি খুব একটা।
মস্ত বড় চাঁদটার জন্য খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না আঁধার। চাঁদের আলোর রং এখন ডিমের হালকা কুসুমের মতোন হলদেটে। তাকিয়ে থাকলে নেশা ধরে যায়।
আজ অবশ্য জহরের এমনিতেই নেশা চড়েছে। কাজে নামার আগে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করা হয়েছে। তাই হয়তো ফুসফুসভর্তি বাতাস নিয়েও জলের নিচে থাকা যাচ্ছে না বেশিক্ষণ। জহরের মনটা ভালো নেই। মাথাটা জলের ওপর তুলে একটু জিরিয়ে নেয় সে। বুক ভরে নেয় নিঃশ্বাস।
মাথা ঝিমঝিম করে। চেনা সন্ধ্যা নদীটাকে অচেনা মনে হয়।
বর্ষাকালে সন্ধ্যা নদীর জল বেড়ে যায় অনেক। টইটম্বুর জল। সে ঘোলাটে জলের নিচে লুকানো থাকে সুন্দরী কাঠ। সে কাঠ বড় দামি। রাজ-রাজড়াদের কাঠ।
বহু দূরের শহরে এ কাঠ বিকোয় ভালো দামে। সুন্দরী কাঠ দিয়ে তৈরি পালঙ্কের চাহিদা বড় বেশি।
স্বরূপকাঠি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সন্ধ্যা নদীটা।
এ অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ খাট-পালঙ্ক বানানো, স-মিলে কাঠ কাটা, বিক্রি–এসব কাজের সাথে জড়িত। তারা একটা সময় চরম অর্থকষ্টে দিন যাপন করলেও এখন সময় পালটেছে। কাঠের চোরাচালান থেকে ভালোই পয়সা পায় লোকগুলো। যাদের তিনবেলা ঠিকমতো খাবারের জোগাড় নিয়ে চিন্তে করতে হতো, তারা এখন দামি ঢেউটিনের চারচালা ঘর তুলেছে। অবিবাহিতরা বিয়ে করছে আর বিবাহিতরা সাধ করে আরো দু-চারখানা বউ এনেছে ঘরে। খাওয়া, পড়ার চিন্তা চলে গেলে বিয়ে করার বিলাসিতাটা মানায়।

প্রশাসন সুন্দরী কাঠ কাটা ও বিক্রি নিষিদ্ধ করলেও লাভ হয়নি তাতে। কে শোনে সরকারি মানুষের কথা! তারা তো আদেশ দিয়েই খালাস। রুটি রুজি সব তো এই কাঠেরই ওপর। তাই এসব বড় বড় মানুষের কথায় কান দেয় না কেউ।
দিনের বেলা সন্ধ্যা নদীতে সুন্দরী কাঠভরা কোনো নৌকা দেখা যায় না। প্রশাসনের লোকেরা দিনমান ঘুরেও পায় না কাঠের কোনো হদিস। যারাও বা পায়, টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয় তাদের।
ভোরের দিকে এই কাঠ লুকিয়ে রাখা হয় জলের নিচে। দিনের আলো চোখ বুজলেই একদল দোমরা (চোরাচালান করা কাঠ জল থেকে ওপরে ওঠানোর কাজে নিয়োজিত লোকদের স্থানীয় ডাকনাম) পাকা ডুবুরির মতোন নেমে পড়ে জলে। তারপর পুব আকাশে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত চলে জল থেকে সুন্দরী কাঠ ওঠানোর কাজ। রাতের আঁধারে নৌকায় করে এই কাঠ পাচার করা হয় দূর-দূরান্তে।
জহর এই দোমরাদেরই একজন। দিনভর ঘুমালেও রাত জেগে কাজ করে সে। গতর খাটার ব্যাপারে রয়েছে তার ভালো সুনাম।
পরিবারে কেউ নেই জহরের। বাপ মরেছে অল্প বয়সে। মা-টাও কিছুদিন আগে বসন্ত রোগে ভুগে মারা গেল। এখন জহর একা। তাই একটা বিয়ে করা বড্ড প্রয়োজন।
ঘরে একা একা ভালো লাগে না। বউ থাকলে না হয় একটু জমত। জহর তাই টাকা জমায়। দোমরার কাজ করে আয়রোজগারও খারাপ হয় না তার। তবে বিয়ের জন্য অনেক টাকা দরকার।
দোমরার কাজ ভালো লাগে না। বিয়ে করার পর জমানো টাকা দিয়ে চাষবাস শুরু করবে সে। ভালো ঘর দেখে বিয়ে করতে হবে। ভালো ঘর ছাড়া ভালো যৌতুক পাওয়া যায় না। কন্যার বাপগুলা আজকাল খাটাশের মতোন আচরণ করে। শহুরে মানুষদের কথা শুনে যৌতুক দিতে চায় না। এসব কান্ডকারখানায় জহরের মন খারাপ হয়। তার মন খারাপের রোগ আছে। খালি মন খারাপ হয়।
লম্বা সময়ের জন্য ডুব দিয়ে জলের নিচে থাকা যাচ্ছে না আজকে আর। কষ্ট হচ্ছে খুব। তার ওপর একটু পর পর লুঙ্গির গিঁট আলগা হয়ে খুলে যাচ্ছে। মহা যন্ত্রণা। একটু শীত শীত লাগে। বড় বেশি আবছা চারপাশটা। কেমন এক ঘোর লাগা মায়াপুরীর মতোন।
পাড়ে গিয়ে একটা বিড়ি ধরাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু ব্যাপারটা ভালো দেখাবে না। সবাই কাজে ব্যস্ত। এর মাঝে ওঠা যায় না। উঠলেও দোমরাদের বিড়ির ভাগ দিতে হবে। ভাগ দিতে সে রাজি নয়।
পাশেই ভুস করে জলের ওপর মাথা তোলে এক দোমরা। কী নিয়ে যেন কথা বলে হাসতে থাকে। জহরের এসব মাথায় ঢোকে না। চাঁদের আলোয় লোকটার হলদেটে দাঁত সে দেখতে পায় স্পষ্ট। দাঁতের মাঝে কালো কালো দাগ। তামাক খাওয়ার ফল। ওপরের পাটির মাংসের ভাঁজে লেগে আছে তরকারির সাদা টুকরো। ঘিন্নে হয়।
এসব কী ভাবছে সে। নিজের দৃষ্টিশক্তির এমন জোর দেখে ভয় লাগে। কী হলো আজ তার। অন্ধকারের ভেতরেও কেন যে সব দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারে না। মাথায় ভয়ংকর যন্ত্রণা শুরু হয়। ভয়ংকর।
হায়্নাহেনার তীব্র ঘ্রাণ তীরের ফলার মতোন মাথাটাকে যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। ঘ্রাণ জহরের সহ্য হয় না। সামান্য আতরও মাখতে পারে না সে গায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। 'জহর ভাই, কনে আছ?' কোনো এক দোমরা ডেকেই যায় তাকে। জহর শুনতে পায়; কিন্তু জবাব দিতে পারে না। ঘুম পায় তার। শরীরটা ভারী ভারী লাগে খুব। লোহার মতোন ভারী।
শীতটাও পড়েছে জেঁকে। বর্ষাকালে এমন শীত তো পড়ার কথা না।
অন্ধকারের ভেতর জলে দানবের মতোন দাঁড়িয়ে আছে নৌকা আর ট্রলারগুলো। জলযানগুলোর ভেতরে থাকা কুপির দুর্বল আগুনের শিখা দেখা যায় দূর থেকে। ধিমি ধিমি আঁচে জ্বলছে আগুন। জহরের সব কথা মনে পড়ে যায়। একে একে সব পোকার মতোন মাথার ভেতর এসে ভর করে। কুটকুট করে কামড়ায়।
এমন রাতে কুপির আলোতে মোমেনার মুখটা বড় মায়াবী মনে হতো। তিরতির করে লজ্জায় কাঁপত তার চোখের পলক। মুখে ছিল বসন্তের দাগ। তার পরও কম সুন্দরী ছিল না মেয়েটা। গায়ে-গতরে যেকোনো শহুরে ডবকা নারীর সাথে পাল-া দিতে পারত সে।
সবই ভালো ছিল মেয়েটার। ভালো ছিল না শুধু স্বভাবটা। নইলে মহাজনের ছোট বউ হয়েও কেন নজর দিল তার দিকে! জহর যুবক ছাওয়াল। এড়িয়ে যাবার সাধ্য যে তার নাই।
মোমেনা গন্ধমাখা সাবান দিয়ে ধোয়া শরীরটা নিয়ে যখন পাশ ঘেঁষে বসত তখন দম বন্ধ হয়ে আসত। মনে হতো যত বড় ডুবুরিই সে হোক না কেন, মোমেনার মনের নদীতে বেশিক্ষণ ডুব দিয়ে সে থাকতে পারবে না। নিঃশ্বাসেই কুলোবে না। এ নদী, সন্ধ্যা নদীর চেয়েও কয়েক গুণ ভয়ংকর। একবার ডুব দিয়ে তাই আর পাড়েই উঠতে পারল না জহর।

শহুরে লোকদেরও অবশ্য দোষ আছে। হাস্নাহেনার ঘ্রাণে ভরা গন্ধ সাবান বানিয়েই তারা যুবক ছাওয়ালদের মাথা খায়। মাথা খেয়ে শেষ করে দেয় সব।
শরীরের লোভ কদিনই বা থাকে। জহর তাই এবার ভালোবেসেই ফেলল মেয়েটাকে। তাতেই হলো বিপদ। মোমেনার মতোন স্বভাব খারাপ মেয়েও ভালোবাসল জহরকে। সেই পৃথিবীর আদিম, পুরনো গল্পের মতোন।
মহাজনের চোখে না পড়লেও পালাতে চাইল জহর। তার যৌতুক দরকার। মোমেনার কাছ থেকে যৌতুকের কোনো আশা নেই। এক বাপ কয়বারই বা যৌতুক দিতে পারে!
মোমেনা শুনল না এসব। বিয়ে করার ইচ্ছে তার। শুনলই না জহরের কথা। নিল ফাঁস। সুন্দরী গাছে দড়ি পেঁচিয়ে পড়ল ঝুলে। বোকা মেয়েজাতি। ফাঁস নেওয়ার আগে একটু শলাপরামর্শ করলেও তো পারত।
আর মরবি তো মর, সুন্দরী গাছেই কেন ফাঁস নিতে হবে। রাজরাজড়াদের গাছ। টাকার গাছ।
এখন ওই গাছের ধারেকাছেও কেউ যায় না ভয়ে। মোমেনার মতো গাছটাও মরল একদিন। পুরো রাত সেদিন হাস্নাহেনার ঘ্রাণে ভরা ছিল গাছটার চারপাশ। জহর টের পেয়েছিল। মোমেনাকে ভালোবাসে বলেই একা একা রাতে গাছের তলায় গিয়ে বসে থাকত। করত বিলাপ। ভয়ে কেউ এদিকে আসত না বলেই বাঁচোয়া।
কেউ জানেনি তাদের কথা। এমনকি মোমেনার পেটে বাচ্চা ছিল এটাও চাউর হয়নি বাইরে।
লোকলজ্জার ভয়ে মহাজন জানায়নি কাউকে। বাচ্চার বাপ খুঁজতে গিয়েও হয়নি কোনো লাভ। কোনো রকমের ঝামেলা ছাড়াই দিন কাটছিল তাই জহরের। সাদামাটা, সহজ-সরল দিন। হুট করে একদিন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল সে। তেল চুপচুপে চুল চির"নি দিয়ে আঁচড়িয়ে ঠিক করল বিয়ে করতে হবে। খুব খেটেখুঁটে তাড়াতাড়ি করে জমাতে হবে টাকা। কিন্তু মোমেনার এটা সহ্য হলো না। সহ্য হলো না সুন্দরী গাছটারও। তাই তো চৌপর দিন হাস্নাহেনার ঘ্রাণ ছড়িয়ে জ্বালিয়ে মারে তাকে। কই থেকে যে আসে এই ঘ্রাণ। সহ্য হয় না। নাকের সামনে শুকনো মরিচ পুড়ে ধরলেও যায় না। কষ্ট হয়। যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে যায় মাথা।
ঘুম ঘুম ভাবটা কাটে জহরের। হাস্নাহেনার ঘ্রাণটা নেই এখন। ঢেমনা চাঁদটাকে আকাশে দেখতে ভালো লাগে খুব। চাঁদটাকে আজ কাচপোকা টিপের মতোন মনে হচ্ছে।
মোমেনা মাঝে মাঝে এমন টিপ দিত কপালে। কী সুন্দরই না লাগত তখন তাকে। মুখভর্তি বসন্তের দাগ যেন নিমিষেই যেত উবে।
চাঁদের শরীর ভর্তি দুধসাদা আলো চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে সন্ধ্যা নদীর জলে। জলের ভেতর থেকে চাঁদের আলো দেখতে বড় অদ্ভুত লাগে জহরের। দেখতে দেখতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সামান্য বাতাসের জন্য ফুসফুসটা পাগল হয়ে ওঠে। শরীর ঠেলে বাইরে বের হয়ে আসতে চায়। মোমেনা কি আজই শাস্তি দেবে তাকে!
কাঁধের ওপর সুন্দরী কাঠের ভারী গুঁড়ির অস্তিত্ব টের পায় সে। সেটার ভার বেড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। জেদই কাল হলো। ক্যান যে পানিতে নামতে গেল!
পানিতে নেমেই মাথাটা এলোমেলো হয়। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে পৃথিবীটা আর দেখা হবে না এটা বুঝে যায় জহর। অনেক ক্ষমতাধর কেউ একজন তাকে চায় না আর পৃথিবীতে। তার শরীরটা সুন্দরী কাঠের মতোনই ভারী হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। পাগুলো শিকড় হয়ে নদীর অতলান্ত জলেরও নিচে থাকা নরম, ভেজা কাদা আঁকড়ে ধরে।
কবরের জন্য তবে কি মাটি পাবে সে, নাকি জলেরই ওপর পেটফোলা কুৎসিত লাশ হয়ে ভাসতে হবে দিনের পর দিন। জহর মরে যাচ্ছে। এ নিয়ে আক্ষেপ নেই কোনো। জলের নিচ থেকে মাথা তুলে চাঁদটাকে আরেকবার দেখার জন্যই এ মুহূর্তে তার যত বুকভর্তি হাহাকার। কাচপোকা টিপটাকে আরেকবার সে দেখতে চায়। আরেকবার দেখতে চায় মোমেনার ডুরে পাড়ের হলদে শাড়ির আঁচল, নরম পায়ের পাতা, না দেখা সন্তানের মুখ, বাড়ির পেছনের পেঁপে গাছটা, পাট শাক, কুপির পোড়া সলতে, সদ্য লেপা বাড়ির উঠোন, গুইসাপ, মাছরাঙা, কাঁঠাল পাতা, পাটিসাপটা পিঠা আরো যা যা এখনো দেখা হয়নি সব।
এক জীবনে কত কিছুই না অদেখা রয়ে যায় মানুষের। কতই রহস্যই না থেকে যায় অজানা। ফুরিয়ে আসছে সময়। মরে যাওয়ার আগে জহর বলে, 'আফসোস, বড়ই আফসোস।' জলের নিচে বলে সে কথা জীবিত কোনো মানুষের কানে এসে পৌঁছায়
না। কিন্তু সে ঠিকই শুনতে পায় কোনো এক দোমরার ডাক। 'জহর ভাই, কনে আছ?' জবাব দেওয়ার জন্য মনটা অনচান করে তার। আনচান...।

---o---

**চা;ঘুম**

---

---

ছেলেটা সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে।
ছেলেটা দাঁড়িয়ে বিকেল থেকে সদর দরজার সামনে।
ছেলেটা অপেক্ষা করছে সন্ধে থেকে।
বয়স তার দশ কি বারো। ছোট করে ছাঁটা চুল। মুখে বসন্তের দাগ। নাকে ছোট্ট একটা আঁচিল।
কোটরে ঢুকে যাওয়া ছোট, নিষ্প্রভ দুটি চোখ দেখে বড্ড অসহায় মনে হয়। অসহায় মনে হয় তার আবছায়া এলোমেলো চাহনি দেখে।
টানা কয়েক ঘণ্টা কাঁদার কারণে চোখ দুটো এ মুহূর্তে আছে ফুলে।
সে ক্ষুধার্ত। গতকাল থেকে খায়নি তেমন কিছুই। তাই নেতিয়ে পড়েছে শরীর। দেহের কলকব্জাগুলো যে ঠিকমতো সাড়া দিচ্ছে না তা তার মলিন, ক্লান্ত মুখ, চোখ দেখেই ঠাওর করা যায় সহজে।
বৃষ্টি হচ্ছে এখন। বাইরে শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝি পোকার একঘেয়ে ডাক।
খেপেছে খেঁকশিয়ালগুলো। মাঝরাতেও টিনের চালের ওপর গোটাকতক বাঁদর শুর" করেছে বাঁদরামি।
এ অবস্থায় ছেলেটিকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। সে হারিয়ে গেছে মাঝরাতের আঁধার আর বৃষ্টির ভেতর। হারিয়ে গেছে জল-জঙ্গলের কাব্যে।
আমি সবকিছু ভুলে শীতের ভেতর কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ভাবছি–'এভাবে কি ঘুমানো যায়! মাঝরাতের বিতকিচ্ছিরি যন্ত্রণা। শালা এবার বাড়ি গিয়ে আর ফিরবই না। ছেড়ে দেব চাকরিটা। ছেড়ে দেব।'
জানি চাকরি ছাড়া হবে না।
জনমানুষের ভিড় ছেড়ে একদল প্রায় জংলি, অসভ্যদের সাথে থেকে চিরদিনই করতে হবে পাহাড়ে বসবাস।
প্রতিদিন ভোরেই আমার ঘুম ভাঙবে হীরেন্দ্র নাথ নামের এক আধা ন্যাংটো, শ্বাসকষ্টরোগী, আধ বুড়োর ডাকে, যে কিনা কানের কাছে এসে ফ্যাসফ্যাস করে বলবে, 'ছুকরি আনিচি বাবু। কচি হলিও ছলাকলা মন্দ জানিনি সে। শরীল পাতি দিবানে সুন্দর করি বাবু। আরাম করতি পারবিন।'
ছুকরি পাওয়ার লোভনীয় সুযোগ পায়ে ঠেলে আমি বলব,' হটো হটো। মে বহাত খুব ভালা আদমি। ছুকরি টুকরি নেহি চাহিয়ে। ইয়ে আমার জন্য শরমিন্দা কি বাত হ্যায়।'
প্রতিদিনই ঘুমানোর সময় এসব ভাবনা আমার মাথায় এসে যখন ভর করে তখন ভাবি পাহাড়ে সাপ, জোঁক, জংলিদের সাথে থাকা শহুরে ছেলেটার ছয় মাসের মধ্যে শহর ছেড়ে পাহাড়ে এসে পাহাড়ি হওয়ার চেষ্টা করাটা সহজ কাজ নয়। রাজধানী ঢাকায় থাকার সুযোগ হারিয়ে পনেরো হাজার টাকা বেতনের জন্য মাধবপুর লেকের কাছাকাছি একটি জঘন্য চা-বাগানে চাকরি করতে আসা এবং পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়ার ভাবনগুলো ভেবে ঘুমানোর আগে আগে প্রায় প্রতিটি রাতেই আফসোস হয় আমার খুব।
ভাবতে ভাবতে একটা সময় বুকে কষ্টমতো কিছু একটা টের পাই। এরপর আমি একটু কাঁদার চেষ্টা করি। কখনো কখনো কাঁদিও।
আমার কিন্তু অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন ছিল। আর দশটা বাবার মতোন আমার বাবাও বলেছিলেন, 'বাবা, বড় হও। এতটাই বড় যে তোমারে কেউ ছুঁইতে না পারে।' আমি বাবার কথা রাখতে পারিনি। বাবাকে বলতে পারিনি যে আমার ভেতর বড় হওয়ার মতন কিছু নেই। আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। সবাই বড় হতে পারে না।
আর দশটা পরাজিত মধ্যবিত্ত বাবার মতোই মৃত্যুর আগে তিনি আমাদের জন্য কোনো সহায় সম্পদ রেখে যেতে পারেননি। রেখে গিয়েছেন কিছু বিরক্তিকর একঘেয়ে উপদেশ। যেমন–'জীবনে টাকা-পয়সা বড় কিছু না। আসল হইল সম্মান। সম্মান কামাও, জীবন সুখের হইবে।' 'পড়াশোনা তো তোমারে দিয়া হবে না। একটা রিকশা কিনা দিব, রিকশা চালাইবা। এতে লজ্জা নাই। তারা গতর খাটাইয়া কাজ করে। শ্রমের মূল্য আমাদের বুঝতে হবে।' ' টাকা-পয়সা দিয়া জীবনে কিছুই হয় না। জীবন জীবনের নিয়মে চলে। টাকা-পয়সা জীবন আটকাইয়া রাখতে পারে না।' ইত্যাদি।
যে টাকার প্রতি বাবার এত অনীহা সে টাকার কারণেই বাবার মৃত্যু হয়। বেরসিক রাজরোগ কর্কট বাসা বাঁধে আমার গরিব বাবার শরীরে। টাকার অভাবে শেষের দিকে কেমোগুলোও ঠিকমতো দেওয়া হয়নি তার।

হাসপাতালের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে রোগ যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদতেন বাবা। কখনো কখনো কোনো কারণ ছাড়াই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন আমাকে। বেকার, অপদার্থ সন্তান গালিগালাজেরই যোগ্য। আমি এতে দুঃখ পেতাম না।
বাবার মৃত্যুর দুই মাস পরই বিয়ে করেন মা। প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন বিধবা মহিলার উপযুক্ত পাত্র এ সমাজে নেই বলেই ধারণা ছিল আমার। কিন্তু সে ধারণা ভুল প্রমাণিত করে মোটামুটি ধনী একজন চিকিৎসককে বিয়ে করে সংসার শুর্ করেন আমার প্রতিভাবান, বুদ্ধিমতী মা।
আমি সাহিত্য পড়া উদার মনের ছেলে। ভালোবাসাবাসিতে বিশ্বাস রাখলেও মায়ের এ বিয়েটা মেনে নিতে পারিনি সহজে। তবে নতুন বাবা যখন চা-বাগানে একটি চাকরি জুটিয়ে দিলেন তখন আর তাদের পথের কাঁটা না হয়ে থেকে বরং চলে আসলাম মাধবপুর।
এ নতুন এক জীবন।
এখানে আসার পর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি আর। তার কথা মনে পড়লেও কষ্টটা চুপ করে সহ্য করেছি আর এই জঙ্গলে বনবাসে পাঠানোর জন্য নতুন বাবাকে দিয়েছি গালি।
নতুন জীরনে ঘুমাতে পারি না একদম। ঘুম ঘুম চোখও আসেনা ঘুম হয়ে। দুনিয়ার সব আজগুবি ভাবনা ভিড় করে মাথায়। টের পাই রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ছেলেটা বৃষ্টিতে ভিজে একসা। এই অন্ধকারেও লড়াই করে বেঁচে থাকা পথের ওপর টাঙিয়ে দেওয়া হ্যাজাক লাইটের আলোতে ছেলেটাকে আবছাভাবে দেখা যায়।
ছেলেটা তার মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি ওকে চিনি।
ওর নাম প্রদীপ। প্রদীপ কুমার।
বাবা নেই তার। জুয়া খেলতে গিয়ে কোনো এক পাষন্ড ভাঙা মদের বোতলের একটা অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছিল পেটে। মরে যেতে সময় লাগেনি বেশিক্ষণ।
তারপর থেকে মায়ের সাথেই আছে প্রদীপ। প্রদীপ, ছোট বোন রীনা আর তার মায়ের সাথে পরিচয় আমার চাকরির প্রথম দিনেই।
হীরেন্দ্র নাথ সেদিন ওর মাকে নিয়ে আমার ঘরে এসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলেছিল,' আজ এ বেটি পাক করি দিবে বাবু। চালি রাইতে রাখি দিবারও পারবিন।'
সেদিন মায়ের পিছে পিছে প্রদীপ আর রীনাও এসে হয়েছিল হাজির। প্রদীপের মায়ের পাক করা খাবার সেদিন খেয়েছি আমি ঠিকই; কিন্তু তাকে রাতে রেখে দেওয়ার ইচ্ছে আমার হয়নি।
এসব আমাকে দিয়ে হয় না। ভার্সিটি থাকার সময় অনেকবারই বন্ধুদের সাথে মিলে গাউছিয়া হোটেলে গিয়েছি; কিন্তু এসব করার সাহস বা ইচ্ছে কখনোই হয়নি আমার। কখনোই ইডেন কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে শিস দিয়ে সুন্দরী মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারিনি। বড় বেশি অপদার্থ বলেই একটু খারাপ হওয়া থেকে বারবার পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে বন্ধুদের হাসি, ঠাট্টা, তামাশা।
অল্পদিনেই এই অপদার্থ আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল প্রদীপ। জমিয়ে আড্ডা দিই তার সাথে। ভোজপুরী আর আসামি ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত চা-বাগানের শ্রমিকরা বাংলা বলতে পারে সামান্যই। কিন্তু প্রদীপের বাংলাটা দারুণ। মাধবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে বলেই হয়তো বাংলাটা রপ্ত করতে সমস্যা হয়নি খুব একটা।
প্রদীপের কাছেই জানলাম, সপ্তাহে পরিবার প্রতি মাত্র দুই কেজি আটা দেওয়া হয় তাদের। প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ করার পর পারিশ্রমিক পায় আটচলি- শ টাকা। কমপক্ষে তেইশ কেজি পাতা ওঠাতে হয় দিনে।
ছেলেটা তাই আফসোস করে বলে, 'আর বলবেন না বাবু, তিনবেলা খাবার পারি না খাতি। উপোস যায় প্রায়ই। খাবারের স্বাদও নয় সন্তোষজনক। তা ছাড়া প্রতিদিন অই এক চা পাতার ভর্তা ভাতদি মাখি খাতি ভাল- াগে না আর। আমি শিক্ষিত্ হলি দেখপেন প্রতিদিন মাংস খামু। মাছও থাকবি পাতে দেখপিননি।'
প্রদীপের কথা শুনে আমার ভালো লাগে। ওর লোভ কিংবা মাংস খাওয়ার স্বপ্ন আমাকেও ছুঁয়ে যায়। আমার বেরসিক মন দুঃখে-কষ্টে আরো বেশি নাজুক হয়ে পড়ে।
ছেলেটার সাথে আমার প্রাণের বন্ধুত্ব। ওকে আমি রবীন্দ্র, বিভূতির বইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আর বিনিময়ে ও আমাকে শেখায় ছিপ-বিশেষ চাড় দিয়ে মাছ ধরা, গাছে চড়া, কাগজ বিড়ির মতোন ভাঁজ করে তা ফোঁকা আর অল্প সময়ে পুরো চা-বাগান চক্কর দেওয়ার পদ্ধতি।
আমার কান্ড দেখে অবাক চা-বাগানের সব শ্রমিক। তাদের প্রতিটা উৎসবে যাই। নেচে-গেয়ে রাতে হালকা সুরা পান করে আনন্দে মাতি। রাত হলেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে জংলি, ছোটলোকগুলোর খাবারে ভাগ বসাই। চা পাতা আর অনেকটা লেবুর রস দিয়ে বানানো ভয়ংকর ঝাল চা ভর্তা খেয়ে আমার নাক, চোখ থেকে জল গড়াতে দেখে ওরা খুব খুশি হয় । ময়লা হুলুদ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে, 'বাবু'নি তুম আভি বি বাচ্চা আছ।'

কষ্টে থাকলেও ওরা যেন ভালোই আছে। বেঁচে আছে খেয়ে-পরে। অভিযোগ ওদের সামান্যই। মাঝে মাঝে ঝগড়া হলেও তার মিটমাট হতে দেরি হয় না খুব একটা।

দুঃখ, ভয় শুধু চা-বাগানের মালিক বখতিয়ার সাহেবকে। একটু বেশিই রকমের ধনী এই লোকটি যখন মাসে একবার বাগানে আসেন তখন সবার ঘুম হারাম হয়ে যায়।

ধনী মানুষটির ছোট ঘরের মেয়েদের বড়ই পছন্দ। কিছুটা হাওয়া বদলের জন্য তিনি এসে বাগানের বাংলোতে থাকেন দু-এক দিন।

এরই মাঝে হীরেন্দ্রনাথ ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়ে জোগাড় করে। বয়স্ক মালিক নিজের পছন্দমতো বেছে নেন কোনো ছুকরি বা মধ্যবয়স্ক নারীকে। কালেভদ্রে কখনো বাংলোর সামনে পড়ে থাকে নারীর উলঙ্গ লাশ। সেদিন সামান্য হৈচৈ হয়। একঘেয়ে জীবনের মাঝে এই ছন্দপতনে অনেকেই খুশি হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বখতিয়ার সাহেবকে ধন্যবাদ দেয়। বাগানের কতিপয় তরুণ তার ভক্ত হয়ে ওঠে।

রাত শেষ হয়ে ভোর হচ্ছে। আকাশে ছড়ানো আঁধারের কণা ধুয়েমুছে সাফ করছে আলো। সূর্যের লালচে আলোর গুঁড়ো যেন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে কেউ আকাশে। বৃষ্টি কমে এসেছে অনেকটা। একটু শীত শীত ভাব চারদিকে।

ঘুম আর হলোই না আমার। মশার কামড় খেয়ে যাচ্ছেতাই অবস্থা। মায়ের কথা মনে পড়ল হঠাৎ। আমি মশারি টানিয়ে ঘুমাতে পারি না বলে মা রাগ করত খুব। বলত, 'মশারি টানা, নইলে ডেঙ্গুফেঙ্গু হলে বুঝবি মজা। একটা মাত্র ছেলে আমার, তার ডেঙ্গু হলে আমার কী হবে! তুই বড় হয়ে চাকরি করে মাকে খাওয়াবি, সে আশাতেই তো দিন গুনছি।' আহা রে মা আমার। ছয় মাসের জমানো বেতন দিয়ে মাকে একটা শাড়িও কিনে দিতে পারলাম না।

গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বের হলাম বাইরে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ক্লান্ত হলেও ঘুম নেই চোখে। প্রদীপকে দেখলাম ক্লান্ড় হয়ে পথের ওপরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রাণের বন্ধুর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল সে। বন্ধুর বিপদে আরেক বন্ধু এগিয়ে আসবে–এমনটাই ঠিক করেছিলাম আমরা। কিন্তু পারলাম না। চাকরিটা বড় প্রয়োজন। বড়ই প্রয়োজন। নতুন বাবার মুখোমুখি হতে চাই না আমি আর।

তা ছাড়া চা-বাগানের নারী শ্রমিকদের কাছে এগুলো খুবই সামান্য ব্যাপার। আমি জানি, ঠিক ঠিক সকালে বাড়ি গিয়ে প্রদীপের জন্য আটার রুটি বানানোর জন্যে উনুনের পাশে বসবে তার মা। এক রাতের ঘটনা নিমিষেই ভুলে যাবে সবাই। এই খতরনাক মালিকের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে লাভ নেই কোনো, সেটা এ বাগানের সব শ্রমিকেরই জানা আছে। কেউই চায় না বাড়ির পুরুষের দু-একটা লাশ পড়ে থাকুক যেখানে-সেখানে।

আমি হাঁটতে হাঁটতে প্রদীপকে ফেলেই মাধবপুর লেকের বাগানের দিকটায় চলে আসি।

হঠাৎ শুনি মানুষের চিৎকার। 'ভগবান। হে ভগবান' বলে ছুটতে দেখি হীরেন্দ্রনাথকে।

চা-বাগানের দিকে ছুটছে সবাই। ছুটছেন বখতিয়ার সাহেবও।

আকাশের পাখিরা শুরু করেছে পাগলামি। তাদের ডাকাডাকিতে নরক অবস্থা। শ'খানেক বাঁদর নেমে এসেছে মাটিতে।

চা গাছগুলোর ঘুম ভেঙেছে আজ। শত বছরের ঘুম। পুরো বাগান রক্তে সয়লাব। কেউ পাতা ছিঁড়লেই গাছের শরীর ফুঁড়ে বের হচ্ছে দমক দমক রক্ত। তাজা রক্ত।

কেয়ামত কি আজ? মাকে তো শেষবারের মতো দেখতে পারলাম না। দেখার যে ইচ্ছে ছিল খুব !

আচমকা মৃত্যুভয় চলে যায় আমার। এক দৌড়ে চলে যাই বখতিয়ার সাহেবের বাংলোতে। গিয়ে দেখি লাশ পড়ে আছে সেখানে।

প্রদীপের মায়ের লাশ।

বুঝে যাই সব কিছু। মানুষ এই ছোট্ট ছেলেটার ডাকে সাড়া না দিলেও চা গাছগুলো দিয়েছে। এত দিনের পুরনো সম্পর্কের জন্য নিজের শরীর থেকে রক্ত ঝরিয়ে করছে প্রতিবাদ।

বয়স দশ কি বারোর ছেলেটা মায়ের লাশটা তোলার চেষ্টা করছে এ মুহূর্তে। তবে সুবিধা করতে পারছে না খুব একটা। সামান্য শরীরের শক্তিতে কুলোচ্ছে না তার।

সাহায্য করার জন্য কাছে যেতেই চিৎকার করে উঠল প্রদীপ।

তার চোখে এখন রাজ্যির ঘৃণা।

বন্ধুর জন্য ঘৃণা।

ভগবানের জন্য ঘৃণা।

পৃথিবীর তাবৎ মানুষের জন্য ঘৃণা...।

---o---

## বাগানবিলাস

---

---

বুবুদের বাড়ির সামনে ফুল ফোটে। লাল লাল ফুল।
থোকায় থোকায় ফুটে থাকে। সংখ্যায় অনেক। ওতে মধু হয়। প্রতিদিন বিকেলে মধু খাওয়ার জন্য জড়ো হয় ছোট ছেলেমেয়েরা। তারা ফুল কুড়ায়। ছেঁড়া ফুলের মধু খায়।
খাওয়ার সময় তছনছ করে গাছের চারপাশটা। সবু সবু ঘাসগুলো পায়ে পিষে ভোঁতা করে দেয়।
কখনো কখনো ফড়িং ধরে। ভেঙে দেয় ডানা। লাল, নীল হরেক রঙে সাজানো ফড়িংগুলো তখন আর উড়তে পারে না। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে মাটিতে।
বাড়ির গেটটাও ঢেকে আছে ফুলে। বাগানবিলাস ফুল। লতানো ঝোপ। এঁকেবেঁকে জড়িয়ে ধরে আছে পুরো জায়গাটা। ফুলগুলো যখন ঝরে তখন পুরো পথটা ঢেকে যায়। পথটাকে দেখলে মনে হয় মস্ত এক ম্যাজেন্টা রঙের কুর্তা জড়িয়েছে গায়।
বাড়িটা দোতলা। ওপরতলায় বুবু থাকে আর নিচের তলায় মাহবুবারা।
ওরা ভাড়াটিয়া। অনেক বছর ধরে আছে এ বাড়িতে। মাহবুবা মেয়েটার সাথে আমার জমত খুব। কলেজে ছুটিছাঁটা পেলেই এসে উঠতাম বুবুর বাড়ি। কিছুতেই তখন পিছু ছাড়ত না আমার। আসলে সবার সাথে মিশতে পারত না ও।
কেন জানি না আমাকে পছন্দ করল খুব। রাজ্যির গল্প এসে করত আমার সাথে। আমিও এই ছোট্ট মেয়েটাকে সময় দিতাম। দিনভর লুডু খেলতাম। খেলতাম রুমাল চুরি, কলম লড়াই, এলাটিং-বেলাটিংসহ আরো নানা হিজিবিজি খেলা।
এসব খেলা ছাদে বসেই হতো। নিচতলায় ওর বাড়িতে যাওয়া হতো না কখনোই। মাহবুবা চাইত না। বুবুও নিষেধ করত। বলত, 'জানিস, ওর একটা পাগল ভাই আছে। গেলেই কামড়ে দেয়। গো গো করে ডাকে। যাসনে কখনো।'
কৌতূহল হতো আমার। খুব ইচ্ছে হতো নিচে ঢুঁ মেরে আসি একবার। তবে লাজ-লজ্জার বালাই খেয়ে ওদিকে পা মাড়াইনি কখনো।
সেবার বাড়িতে সুজি নেই। বোনের মেয়ে জারা কাঁদছে সমানে। তার কান্নার জোরে পাচিলের ওপরের কাকেরা পালিয়েছে সব। ভেন্টিলেটরে বাসা বাঁধা চড়ুইগুলোও চেচাচ্ছে তাল মিলিয়ে।
বুবু আমাকে মাহবুবাদের বাসায় যেতে বললেন। সুজি পাওয়া যায় কি না দেখার জন্য। ভয়ে ভয়ে গেলাম নিচে। টোকা দিলাম দরজায়। বুকের ভেতরটা গমগম করছে। কোন না দত্যি-দানো এসে হানা দেয় আমার ওপর।
দরজা খুলল মাহবুবার মা। মধ্যবয়স্ক। অল্পতেই বুড়িয়ে গেছেন মহিলা। মাথার চুল অধিকাংশই সাদা। তবে চোখটা জ্বলজ্বলে। কেমন যেন মায়া মায়া ভাব।
ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে চিৎকার। কান্নার আওয়াজ। কে যেন কাচের জিনিসপত্র ভাঙছে।
আমার কৌতূহল দেখে ভেতরে ডাকলেন মাহবুবার মা। পুরো ঘরের মেঝে ভর্তি ভাঙা কাচের টুকরো। আর এসবের জন্য যে দায়ী সে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তার সারা গায়ে ধুলো-ময়লা। মুখে হাসি। বোঝা যায় ভাঙাভাঙির কাজ করে ভালোই আনন্দ পাচ্ছে।
মহিলা বসতে বললেন। তারপর নিজের ছেলেকে কোনো রকমে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেলেন ভেতরের দিকে। আমি বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবনা ভাবতে লাগলাম। এত বড় ছেলের এহেন আচরণের মানে কি! চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় ছেলেটির বয়স পনেরো পেরিয়েছে অনেক আগেই।
কিছুক্ষণ বাদে ফিরলেন মহিলা। হাতের ছোট্ট বাটিতে সামান্য পায়েস। খেতে দিলেন আমাকে। চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় পেয়েছ? ভয়ের কিছু নেই। ও আমার বড় ছেলে। লক্ষ্মী ছেলে।' ভয় পাইনি বলে মাথা নাড়লাম।
তাকে দেখে মনে হলো তিনি আরো কিছু বলতে চান। অনেক কিছু। বললেন তিনি। তার ছেলের কথা। লক্ষ্মী বড় ছেলের কথা।

ছেলেটির বয়স তখন মাত্র চার। এক সড়ক দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পায়। দুটো গাড়ির ঠোকাঠুকি। গাড়ি থেকে ছেলেটি ছিটকে পড়েছিল পথের ওপর। তারপর থেকে সে গায়ে-গতরে বেড়েছে অনেকখানি; কিন্তু ভেতরের চিন্তাভাবনা থেকে গেছে ছোট্ট বাবুটির মতো।

এখনো সে আউড়ায় 'টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার।'

হাঁটতে পারে না। মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়ে ঘুরে বেড়ায় ঘরময়। ভয় পেলে মুখ লুকায় মায়ের বুকে। রাগে-ক্ষোভে কাঁদে গো গো করে।

কোনো চিকিৎসকই বাতলাতে পারেনি এ সমস্যার কোনো সমাধান।

ছেলেটিকে নিয়ে মায়ের হুজ্জোতের শেষ নেই। সারা দিনই কাটে তাকে নিয়ে। ঘুম পাড়ানো, খাওয়ানো আরো কত কাজ!

এই ছেলেকেই কি না বাইরের লোকেরা বলে দত্যি-দানো। অদ্ভুত।

কথা শেষ করে মাহবুবার মা কাঁদলেন। মায়েদের কাঁদার বদঅভ্যাস আছে। মাথা ঘামালাম না। সেদিনের মতো চলে গেলাম। বুবুর ঝাড়ি খাওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার ।

তারপর আসা হতো প্রায়ই। সময় কাটত ছেলেটির সাথে। বয়ামভর্তি লেবেনচুস নিয়ে আসতাম আমি। ভাইকে নিয়ে মাহবুবার লজ্জাও কেটে গিয়েছিল। রংবেরঙের মার্বেল নিয়ে খেলতাম আমরা।

মাঝে মাঝে একসাথে কালীবাড়ি রোড পেরিয়ে চলে যেতাম বি এম স্কুলের মাঠে। মস্ড় মাঠ। মাঠজুড়ে মানুষের ভিড়। চানাচুর আর ঝাল মুড়িওয়ালারা জমজমাট করে রাখত চারপাশ।

বিকেল বিকেল কার পোষা কবুতরগুলো জানি এসে হাজির হতো মাঠে। ময়ূরের মতো পেখম মেলতে চাইত তারা। এসব দেখে ছেলেটির কি আনন্দ!

হুইল চেয়ারের ওপর বসে দু হাত তুলে দিত আকাশে। মনে হতো সে-ও পাখি হতে চায়। দুটো পাখা থাকলে কে-ই বা ঠেকাত তাকে !

ভাইয়ের আনন্দ দেখে 'কি মজা, কি মজা' বলে চিৎকার করত মাহবুবা। তখন পাখিরা উড়ত। ঢাউস আকাশটার সীমানাজুড়ে। ওদের ডানার ঝাপটানি মিলিয়ে যেত ধীরে ধীরে। কতই না কারসাজি! বিকেলের আলো এসে ভর করত ছেলেটির মুখে। কেন ওকে সবাই দানো বলে ?

ওতো শিশু। ছোট্ট একটা আদুরে শিশু। কদিন বাদেই শিশুটিকে ছেড়ে চলে যেতে হবে আমার। ফুরিয়েছে ছুটি। মন খারাপ হয়। আমি একা একা আলো মাখি। শেষ বিকেলের মন খারাপ করা আলো।

এরপর কাটল অনেক দিন। এক ছুটি শেষ হয়ে এসেছে আরেক ছুটি। পিঠেপিঠি দিনগুলো পার করে এবারও এসেছি বুবুদের বাড়ি।

বাড়ির সামনে অনেক ভিড়। শোনা যাচ্ছে মাহবুবার মায়ের বিলাপ। কান্না আর কান্না। এর মাঝে ঠাঁই নেই অন্য কোনো শব্দের। যাকে নিয়ে এই ভিড় তার গায়ে কাফনের কাপড়। নিথর, নীরব একটা দেহ। কোনো চেঁচামেচি নেই। নেই গো গো শব্দ।

কানাঘুষা করে কেউ কেউ বলছে, 'মরে গিয়ে বাঁচিয়েছে মাকে। আপদ বিদেয় হলো।'

বুঝলাম মারা গিয়েছে মাহবুবার ভাই। খুঁজতে খুঁজতে মাহবুবাকে পেলাম ছাদে। কাঁদছে। কাঁদুক ও। কেঁদে চোখ-মুখ ফুলাক। ফুল ফুটেছে আজ বাগানবিলাসের ঝোপে। অনেক ফুল। ঝরে ঝরে ওরা ঢেকে দিচ্ছে ছেলেটির মুখ। কি সুন্দর দৃশ্য। কি সুন্দর !

---o---

## পাতকী

---

---

ক.

শুক্রবারের আজকের রাতটা কিন্তু এমন হওয়ার কথা ছিল না।

কাঁদতে হবে ভাবেনি সায়রা বানু। ঘটবে এমন অঘটন তাও পারেনি করতে আঁচ।

সকালে সূর্য উঠার সাথে সাথেই শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। চড়া রোদ্দুরের ভেতরেও একটানা ভিজিয়েছে পথ, ঘাট, ঘাস আর মানুষকে।

রোদ্দুরের সাথে বৃষ্টির লড়াইটা জমল না বেশিক্ষণ।

বৃষ্টি শেষে এরপর উঠল রংধনুটা। ঢাউস আকাশের একপাশটা বেঁধে ফেলল সে রঙের সুতো দিয়ে। চকিতে শুয়ে চকি লাগোয়া জানালা দিয়ে সব দেখছিল সায়রা বানু। ভালো দেখতে পায় না সে। ছানি পড়েছে চোখে। বয়স তো কম হলো না। চলি- শ ছুঁইছুঁই। ভারী হয়েছে শরীর। পানি জমে ফুলে উঠেছে পা। তার ওপর আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে হয়েছে ঘা। বড় যন্ত্রণা।

যন্ত্রণা নিয়ে সায়রা বানুর বিছানা ছাড়তে ভালো লাগে না।

কিন্তু ছাড়তে হয়। খুব সকাল সকাল খিদে পায় জলিলের। রাতভর মদ গেলার জন্যই হয়তো সকালে ঘুম থেকে উঠে খিদের জন্য কেমন পাগল হয়ে ওঠে জলিল ড্রাইভার।

এ সময় চোখ ছোট হয়ে যায় তার। শরীর কাঁপতে থাকে। ইচ্ছেমতো খিস্তিখেউড় করে তখন।

সায়রা বানুর গায়ে হাত তোলে। মারতে থাকে যতক্ষণ না ক্লান্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত।

পশু হয়ে যায় লোকটা। পশু।

গায়ে জোর সায়রা বানুরও কম নেই। মদ, গাঁজা খেয়ে শরীরটা খুইয়েছে জলিল। তাই তো মারতে গিয়ে সায়রা বানুর সাথে পেরে ওঠে না একদম।

লিকলিকে শরীরের স্বামীটাকে মারতে কসুর করে না সায়রা বানু। বসিয়ে দেয় দু-এক ঘা। কিল, ঘুসি খেয়ে শান্ড় হয় জলিল। মদ খাওয়া জলিলের তখন অভিমান হয় খুব। বউয়ের হাতে মার খাওয়ার দুঃখে চোখের দু কোল ভরে ওঠে তার জলে।

সায়রা বানু এ সময় চেপে ধরে তাকে বুকে। ভরাট, ভারী বুকে ঠাঁই নিতে গিয়ে জলিলের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হলেও শিশুর মতো মুখ লুকিয়ে চুপ করে বসে থাকে সে অনেকক্ষণ।

বউয়ের বুকের ওম তার বড় প্রিয়। জলিল শান্ত হলে পানিতে ইসবগুলের ভুসি গুলে নিয়ে আসে সায়রা বানু। একটু গুড় আর রুটি নিয়ে আসে সাথে।

জলিল খায়। দুর্বল শরীর নিয়ে খেতে পারে না বেশি একটা। নানা রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে। জলিল যতক্ষণ খায় ঠিক ততক্ষণ পাশে বসে থাকে সায়রা বানু। বড় ভালোবাসে সে লোকটাকে। বড় মায়া তার ভেতর লোকটার জন্য।

হবেই বা না কেন? বাঁজা মেয়ে মানুষের সাথে এত দিন ধরে ঘর করে নাকি কোনো পুরুষ!

এমন ভালোবেসে, এমন আদরে কয়টা পুরুষই বা রাখতে পারে মেয়েদের। পুরুষ মানুষ তো আর কম দেখল না সায়রা বানু। খারাপ সব।

বউ দিয়ে হয় না কারো। মেটে না শরীরের জ্বালা। লাগে বাজারের মেয়ে মানুষ। এক, দুই করে অনেক। তাই তো বাজারের মেয়েগুলো খেয়ে-পরে বাঁচে। মেয়ে হয়েও সর্বনাশ করে অন্য মেয়ের সংসার। বাজারের এই মেয়েগুলো সায়রা বানুর দুই চোখের বিষ। আশপাশের বাড়ির বউগুলোর মুখে এদের দোষ শুনতে শুনতে পচে গেছে কান। তার কপাল ভালো যে জলিলের মেয়েমানুষের নেশা নেই।

আছে শুধু মদের নেশা। তা মদ মেয়ে মানুষের চেয়ে অনেক ভালো। সায়রা মদের যন্ত্রণা সহ্য করতে রাজি। করেও যাচ্ছে এতগুলো বছর ধরে। প্রতিদিন একই নিয়ম। একই ঝগড়া, মারামারি, গালিগালাজ। তবে মাঝে মাঝে দিনগুলো অন্য রকমভাবে শুরু হয়। এই যেমন ছিল আজকের দিনটা।

পাঁচ দিনের ট্রিপে ট্রাক নিয়ে জলিল গিয়েছিল ঢাকা। ফেরার কথা বিকেলের দিকে। জলিল নেই, তাই দেরি করেই ঘুম থেকে উঠে সায়রা বানু। সময় নিয়ে বৃষ্টি, রোদ আর রংধনুটা দ্যাখে। তবে বেশিক্ষণ এসব দেখতে ভালো লাগে না। জল দিয়ে চোখের পিঁচুটি ধুয়ে একটু গুড় আর দুটো রুটি কোনো রকমে খেয়ে বাইরে বের হয়।

বেলা হয়েছে। মেয়েমানুষের সারা দিন ঘরে বসে থাকাটা ভালো না। বৃষ্টির পর উঠোনটা কাদায় মাখামাখি। গাছের পাতাগুলো ভিজে ভিজে হয়েছে সতেজ, গাঢ় সবুজ। বাড়ির হাঁসগুলো এলোমেলোভাবে ঘুরছে এদিক সেদিক। ডানা ঝাপটে গা হতে ঝড়াচ্ছে বৃষ্টির জল। রোদে শুকিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট শরীরটা।

এখন রাজা-রানির খোঁজ নেওয়া দরকার। গত রাতের পর আর দেখা হয়নি তাদের মুখ। কাঠের বাড়িটার অবস্থা যাচ্ছেতাই। ওপর হতে জল ঝরে। বৃষ্টিতে ভিজে হয়তো একসা হয়ে আছে রাজা-রানি দুজনেই।

হাঁটু অবধি শাড়ি তুলে হাঁটতে থাকে সায়রা বানু। কাদায় ডুবে যায় পা। যন্ত্রণা শুরু হয় ঘায়ের জায়গাগুলোতে। সে যন্ত্রণা উপেক্ষা করেই সে যেতে থাকে বাড়ির পেছনের জংলা জায়গাটায়। নিরিবিলি একটা জায়গাই দরকার ছিল রাজা-রানির। হৈ-হুল্লোড় তারা একদম পছন্দ করে না। মানুষের ভিড় তাদের বড় অপছন্দের।

সেই প্রথম যেদিন রাজা রানীকে ধরে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল সেদিনই তাদের এ স্বভাব প্রকাশ পায় সায়রা বানুর কাছে। সপ্তাহখানেকের একটা ট্রিপ শেষ করে ফেনী থেকে ফিরেছিল জলিল। মন বড্ড ভালো ছিল তার সেদিন। ট্রিপ শেষে পকেট গরম থাকে আর তখন মদের পেছনে ইচ্ছেমতো টাকা ওড়ানো যায়।

পেটে মদ পড়লে মন উচাটন হয় জলিলের। সে তখন বাজার থেকে নাকফুল, নোলক, চুড়ি, দুল, শহুরে লজেন্স এমন দু-একখানা উপহার নিয়ে আসে সায়রা বানুর জন্য। পেটে মদ পড়তেই ভালোবাসা জেগে ওঠে সায়রা বানুর জন্য।

বউটার মনে বড় দুঃখ। মা হতে পারেনি। মেয়েমানুষের সব অর্জন তো ওই 'মা' থেকে পারাটার মাঝেই। জলিলেরও বড় শখ ছিল বাবা ডাক শোনার। তা হয়নি ভালোই হয়েছে। আফসোস নেই এ নিয়ে তার। 'আন্ডা বাচ্চা হলি যতি যন্ত্রণা। তা হইনি ভালাই হইয়েচে।' সন্তান না হওয়া নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলে এমনটাই জবাব দেয় জলিল।

আড়ালে আবডালে তাকে নিয়ে হাসলে কিংবা দুঃখ করলেও ওসব গায়ে মাখে না সে। তার সন্তান তার গাড়িখানা। ক্লাচ, ব্রেক, গিয়ার, স্টিয়ারিংয়ের মাঝেই বন্দি তার জীবন। আর এ নিয়ে বড্ড সুখীও সে। 'আমি হলেম হালা হুখী মানু। বুইচচ্যাও।' মদ গিলে বউকে এমন করেই নিজের আর সুখের কথা বোঝানোর চেষ্টা করে জলিল।

বোঝাতে গিয়ে সে দেখতে পায় বউয়ের জলে টলমল করা চোখ। সে চোখে দুঃখ অনেক।

জলিল চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করে। পারে না। তবে বোঝে, এ দুঃখ সন্ড়ন না পাবার দুঃখ। একাকিত্বের দুঃখ।

ট্রিপে গেলেই বউটা একা। কথা বলার জন্য হলেও ঘরে কেউ একজন থাকা দরকার। তাই তো ময়মনসিংহের বাজার থেকে দুটো বানর কিনে নিয়ে আসে সে। একদম বাচ্চা বানর।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। যে লোকটা বানরের খেলা দেখাচ্ছিল বাজারে সে একদম সস্তায় ছেড়ে দিয়েছিল বানর দুটো। হয়তো এদের ভরণপোষণের সামর্থ্য ছিল না তার। বানর জলিলের বড় অপছন্দের। কিন্তু এতো সস্তায় পেয়ে আর ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না বানর দুটো কেনার সুযোগ। তা ছাড়া সায়রা বানুও খুশি হবে খুব। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো করে তামা না হওয়ার দুঃখটাও হয়তো মিটবে কিছুটা। বানর দুটো পেয়ে দারুণ খুশি হয় সায়রা বানু। ছেলেটার নাম দেয় রাজা আর মেয়েটার রানি।

নিজ সন্তানের মতো করে বড় করে তাদের। চৌপর দিন পড়ে থাকে বানরগুলো নিয়ে। তাদের খাওয়া, কাপড় কিনে নিজে সেলাই করে জামাকাপড় বানানো, রানির মুখে পাউডার মাখানো, রাজার জন্য খেলনা হাতঘড়ি কেনা–এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকে সায়রা বানু। সে কি আদর।

এসব দেখে হিংসে হয় জলিলের। মদ গিলে বউয়ের বুকে মাথা রাখতে গেলে শুনতে হয় গালি।

বউয়ের বুকের দখল নিয়েছে রাজা আর রানি। এ কী সর্বনাশ নিজে থেকে আনল ডেকে সে! বানরগুলোও বজ্জাত। জলিলের কাছে আসে না কখনো। সারা দিন থাকে সায়রা বানুর কাছে। বোঝে কার কাছে গেলে আদর পাওয়া যাবে।

এক দিন মদ খেয়ে রাগে আচ্ছামতো মেরেছিল সায়রা বানু আর বানর দুটোকে। সায়রা বানু বুঝেছিল বানর জলিলের পছন্দ না। তাই তাদের জায়গা হয়েছে বাড়ির পেছনের জংলা জায়গায়। তুলে দেওয়া হয়েছে ছোট্ট একটা কাঠের ঘর।

রাজা-রানিকে নিজ ঘরের কাছে না পেয়ে কষ্ট হয় সায়রা বানুর। কিন্তু জলিলের জন্য কষ্টটা সহ্য করে সে। রাজা-রানি লাজুক খুব। মানুষের ভিড় দেখলেই তারা চিৎকার করে। ভয় পায়। এক হিসেবে তাই জংলা জায়গায় ঠাঁই পেয়ে বানর দুটোর ভালোই হয়েছে এমন ভেবেই দুঃখটাকে সামাল দিতে পারে সায়রা বানু।

সূর্যটা মাথার ওপর। কাঠের ঘরটার কাছে অল্প সময়েই পৌঁছে যায় সে। ঘরের দরজা খুলে দ্যাখে জবুথবু হয়ে বসে আছে রাজা আর রানি। বৃষ্টিতে ভেজা তাদের পুরো শরীর। ওদের অবস্থা দেখে মায়ায়, কষ্টে কান্না পেয়ে যায় তার।

নিজের শাড়ির আচল দিয়ে মুছে দেয় শরীর। তারপর খাওয়ার ব্যবস্থা করে। খাওয়া শেষে ছেড়ে দেয় ঘরের বাইরে।

এ সময়টায় রাজা-রানি ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। নিজেদের ঘরের দরজাটা খোলা রেখেই এরপর বের হয়ে যায় সায়রা বানু। এ জায়গাটায় চুরি-ডাকাতির আশঙ্কা কম।

আর রাজা-রানি তো আছেই ঘরদোর দেখার জন্য। উল্টাপাল্টা কিছু হলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে তারা।

পাশের বাড়ির মালা বিবির ঘরে ঢুঁ মারতে গিয়েই দুপুরের খাবারটাও খেতে হয় তাকে। বড্ড জোরাজুরির মুখে আর না করতে পারে না। মালা মেয়েটা বড় ভালো। সায়রা বানুকে ভালোবাসে খুব। তার কাছে শোনা হয় নানা গল্প।

সেখানেই জানতে পারে ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবরোধ আজ। এ সড়কের দু পাশে গভীর জঙ্গল। সেখানে শ'খানেক বানরের বাস। তারা নিজেদের মতো করে থাকে। মানুষও তাদের কিছু বলে না। মাঝে মাঝে আশপাশের বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে তারা এটা-ওটা নিয়ে যায়। বানরদের এহেন কান্ড বড় ভালোবাসার চোখে দ্যাখে সবাই। নির্ভয়ে বানরগুলো চলাফেরা করে মানুষের ভিড়ে।

সকালের দিকে বৃষ্টিতে ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তা পার হওয়া একটা বাচ্চা বানরকে চাপা দেয় ট্রাক। এর ঠিক কিছুক্ষণ পরই বানরটার মা রাস্তা থেকে লাশটি আনতে গেলে কোনো এক অজানা আক্রোশে তাকেও মেরে ফেলে ট্রাকের চালক।

এ ঘটনার বদলা নিতেই যেন জঙ্গলের বানরগুলো শুরু করে তান্ডবলীলা। ঢিল আর ডাল ছুড়ে ছুড়ে বন্ধ করে দেয় এলাকায় গাড়ি চলাচল। তাড়া করে পথচারীদের। দোকানদাররা ঝাঁপ তুলে দেয় দোকানের।

এখনো পর্যন্ত সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না। অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ট্রাকের চালকটাকে।

মালা বিবি এসব শুনেছে তার স্বামীর কাছ থেকে। সকালেই বৃষ্টি-বাদলার ভেতরে ময়মনসিংহ শহর থেকে ব্যবসার কাজ সেরে ফিরেছে সে বাড়ি। বানরের এমন পাগলামির কারণেই একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়েছে তাকে আজ।

সব শুনে অবাক হয়েছিল সায়রা বানু। অভিশাপ দিয়েছিল চালককে। ভাগ্যিস, তার জলিল ঝানু চালক। এমন কাজ তার দ্বারা কখনোই সম্ভব নয় বলে বিশ্বাস সায়রা বানুর।

তারপর আলাপ থেমে থাকেনি এক জায়গায়। মালার কাছে সে করেছিল রাজা আর রানির গল্প। রানিটা নাকি আজকাল ছিলান হয়েছে। চোখে চোখে সে যেন সায়রা বানুকে বলে, 'তুই আমারে আর ভালাবাচস্ না। কাচে ডাকচ্ না।' সব শুনে মালা শুধু হাসে। বলে, 'সায়রা বু, তুই পাগোল আচিস্।' সায়রা তার পরও রাজা-রানির কথা বলে যায়। বড্ড ভালো লাগে বানর দুটোর কথা বলতে। সন্ধে হলে বাড়িতে ফেরার কথা খেয়াল হয় সায়রার।

মনে পড়ে, জলিলের তো ফেরার কথা আজ। তাকে না পেলে খিস্ড়ুখেউড় শুর হবে আবার। কত মদ গিলেছে আজ কে জানে!

তা ছাড়া বাড়িতে রাজা-রানি আছে। জলিল তাদের একদম সহ্য করতে পারে না। আবার না রেগে গিয়ে মারা শুর করে দুটোকে। অজানা এক আশঙ্কা নিয়ে বাড়ির পথে পা চালায় দ্রুত।

সন্ধে শেষ হয়ে রাতটা যখন হব হব করছে তখন ঢোকে বাড়িতে। দ্যাখে জলিল ড্রাইভার পৌঁছে গেছে অনেক আগেই। ঘরে আছে রাজা আর রানিও। পুরো পরিবার একসাথে যেন অনেক দিন পর।

কিন্তু এমনটা কখনো চায়নি সায়রা বানু। কখনো না।

জলিলের রক্তাক্ত নিথর দেহটা দেখে ভয় হয় তার। শরীরজুড়ে কামড়ের দাগ। লাশের পাশেই পড়ে আছে তার প্রিয়, আপন মদের বোতলটা, যার অর্ধেকটারও বেশি ভরা আছে মদে।

রাজা-রানি এমন আচরণ করেনি আগে কোনো দিন। করবে বলেও মনে হয়নি সায়রা বানুর। অবোধ প্রাণী ওরা। এত কিছু তো বোঝার কথা না তাদের।

সায়রার সন্দেহ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। তবে কি মহাসড়কে বানর চাপা দেওয়া ট্রাকটির চালক জলিল?

এমন তো হওয়ার কথা নয়। জলিলের রাগ তো শুধু রাজা আর রানির ওপর। অন্য বানরদের ওপর না। রাগ হয় তাই। ঘিন্নে হয় জলিলকে। সেই সাথে যোগ হয় কান্না। জলিলকে ভালোবাসে যে বড়! জলিলের মুখটা অনেকক্ষণ চেপে ধরে সে তার ভরাট বুকে। বউয়ের বুকের ওম পাচ্ছে কি জলিল এখন?

আবেগ অল্পতেই সামাল দেয় সায়রা বানু। রাজা-রানিকে বাঁচাতে হবে। নইলে জলিলকে খুন করার অপরাধে পিটিয়ে মেরে ফেলবে ওদের মানুষেরা। সায়রা বানু জলিলের পর ওদের আর হারাতে পারবে না। কিছুতেই না।

পাশে চুপ করে দাঁড়ানো রাজা-রানির দিকে তাকায় সে। কী নিষ্পাপ চাহনি ওদের। কী দারুণ নরম ও কোমল ছোট্ট দুটো শরীর। কিভাবে ওরা ঘটাল এমন অঘটন?

দোষটা কার? নানা প্রশ্ন ভিড় করে মনে।

কিভাবে কী হয়েছে পুরোটা আঁচ করার চেষ্টা করেও পারে না সায়রা বানু। এক সময় আর চায়ও না চেষ্টা করতে। রাত একটু একটু করে বুড়ো হয়।

বৃষ্টিভেজা সুন্দর সকালের পরে আসে এক দুঃসহ রাত। সামান্য কিছু টাকা আঁচলের খোঁটে বেঁধে বের হয় সায়রা বানু। সাথে রাজা-রানি।
পালাতে হবে। বাঁচতে হবে আর বাঁচার জন্য এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় আসে না তার মাথায়। পথ চলতে চলতে রাতের আকাশের জালে আটকানো আঁধারে মিশে যায় তারা। সায়রা বানুর চোখে জল। সে জল জলিলের মৃত্যুর জন্য নাকি নতুন জীবন, নতুন করে শুরু করতে গিয়ে মনের ভেতরে হুড়মুড়িয়ে আসা অজানা সব বিপদ আর ভয়ের কারণে তা ঠাওর করা যায় না।

খ.

আহ্ আকাশ। কালো স্লেটের মতো আকাশটা চেপে বসেছে সায়রা বানুদের বাড়িটার ওপর। আঁধার গিলে খাচ্ছে, চেটেপুটে খাচ্ছে আলোর শেষ বিন্দুটুকুও। তারাদের আনাগোনা নেই একদম। আশপাশের কোনো বাড়িতে জ্বলছে না কুপি কিংবা হারিকেন। অন্ধকারের ভেতরেও কোনো এক বাড়ির ছেলে সুর দিয়ে পড়ছে, 'সলোমন গ্র্যান্ডে, সলোমন গ্র্যান্ডে। বর্ন অন মানডে, বর্ন অন মানডে।' ডাকছে ঝিঁঝি পোকারা। গুমোট-গরম চারপাশে। গাছের পাতাগুলো স্থির, নির্জীব। হাওয়া নেই একদমই।
একসময় সায়রা বানু ডাক ছেড়ে কাঁদে। সে কান্না জলিলের জন্য তা বোঝা যায় এবার ঠিক ঠিক। বোঝে মনে হয় রাজা-রানিও। তাদের নত মাথা দেখে অপরাধবোধের কথাই তো মনে হয়!
অপরাধটা আসলে কার?
সায়রা বানুর চোখের জল থামার নাম নেই। রক্তমাখা হাত দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকে সে রাজা আর রানিকে। মেয়েরা কাঁদতেও পারে বটে!
হাঁটতে হাঁটতে অনেকটাই পেছনে পড়ে জলিলের বাড়িটা। পেছনে পড়ে থাকে পুরনো জীবন আর বোকা এক ছাত্রের কবিতা। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হওয়া কবিতার কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে কানে বাজতে থাকে সায়রা বানুর। কী দারুণ কবিতা। কবিতার অর্থ না বুঝলেও ভালো লাগে তার। পুরনো জীবনের কবিতাটা তাই সে কষ্ট করে শোনার চেষ্টা করে। কান পেতে। মিইয়ে যাওয়া সুরে ভেসে আসে ছেলেটির কণ্ঠে কবিতার শেষ লাইন–'সলোমন গ্র্যান্ডে, সলোমন গ্র্যান্ডে। ডাইড অন্ ফ্রাইডে, ডাইড অন ফ্রাইডে।...'

---o---

## মোহর

---

---

রাত
ঝিঁঝি পোকা, অশরীরার চোখ আর অশুভ সব ঘটনার ভেতরেও মোহরের ঝনঝনানিতে
কালো কালো সব মেঘের তল দিয়ে ছোটা এক লোভী সার্কাসের মালিকের জন্য বড় মঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
গভীর রাতে গৃহকর্তা নিতিন পাল ওরফে সার্কাসরাজ নিতিন হাড়জিরজিরে অপুষ্টিতে ভোগা এক ঘোটকীর পিঠে চড়ে জঙ্গলের পথ ধরে। চলার পথে আখাম্বা পা দুখানি দিয়ে জাপটে ধরে বুড়ো প্রাণীটির পুরনো চামড়ার পেট।
ঘোটকীর তখন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ম্যালা কষ্ট।

হবেই বা না কেন। পেটে যে বাচ্চা। একটু পর পর ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করে ঘোটকীটা। নিতিন তখন মারে লাথি। জোরসে। পেটের ভেতর মাংসে তা অনেকখানি গেঁথে যায়।

নিতিন এ মুহূর্তে যা করে সব পা দিয়েই। হাত দুখানি দিয়ে কিচ্ছু করার জো নেই। কিভাবে করবে? মুঠোভর্তি মোহর যে তার! অমাবস্যার রাতেও সে মোহর সোনালি আলো নিয়ে জ্বলে উঠতে চায়।

তা ছাড়া চার ফুটের একটা লাশও বয়ে নিতে হচ্ছে সাথে করে। মরার আগে এই জিনিসের ওজন এত্ত বেশি ছিল না। লাশ হওয়ার পর বেড়েছে। যন্ত্রণা।

লাশের কথা ভুলে মোহরের কথা ভেবে নিতিন পাল ভগবানের নাম নেয়। রাজকপাল না হলে তার মতো গরিবের কাছে মোহর কই হতে আসে!

এসব লাশফাশের ঝামেলা একটু পরই চলে যাবে। তারপর শুধু আরাম আর আরাম।

এক মুঠো মোহর আর আরামের কথা মাথার ভেতর নিয়ে সুখী নিতিন পাল গাঢ় অন্ধকারের ভেতর অন্ধের মতো ঘোটকী নিয়ে ছুটতে থাকে। খুব তাড়া তার।

ঘোটকীও নিতিনের প্রয়োজনটা বোঝে। মনিবের লাথি পড়তেই ঘোৎ ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করে দেয় দৌড়।

এই ঘোৎ শব্দ করা ঘোটকী আর নিতিনের চেহারায় তেমন একটা তফাত নেই। এটা অবশ্য নিতিনের শত্রুরা বলে।

ডাহা মিথ্যে। নিতিনের মতো ঘোটকীর থুঁতনির কাছে না থাকার মতো অল্প কিছু দাড়ি নেই।

নেই প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হাতির চোখের মতো ছোট চোখও (এই চোখ দিয়ে সে কিভাবে পৃথিবী দ্যাখে ভগবান মালুম!)

কয়লার চেয়ে অধিক কালো নিতিনকে দেখে শ্বেতবর্ণের ঘোটকীটাও যে মাঝে মাঝে আঁতকে ওঠে না তাই-ই বা কে বলতে পারে!

কালো গাত্রবর্ণের সার্কাসরাজ রাতের আঁধারে মিশে গেলে তার অস্ড়িত্ব ঠাওর করার সাধ্যি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তারও আছে কি না সন্দেহ!

এই কুৎসিত, ধূর্ত, খর্বকায় হাড়ের ওপর রক্ত-চামড়ার বাসা বেঁধে বেড়ে ওঠা নিতিনের আজ বড় আনন্দের দিন।

কপালও বটে তার! সেই ছোট্টবেলায় একবার জ্যোতিষ বলেছিল,‘ রাজকপেল রে তোর ছাওয়াল। রাজকপেল।’ কেউ বিশ্বাস করেনি তখন সে কথা। বরং আশপাশের লোকের কাছে জ্যোতিষ্ শুনেছিল দুয়োধ্বনি।

নিতিন কিন্তু তক্কে তক্কে ছিল। মনে মনে বলছিল,‘ সময় আসুইন, দ্যাকাইয়া দিবাইন, বুঝাইয়া দেবাইন। উম্ !’

নিতিন তার কথা রেখেছে। দেখিয়ে দিয়েছে সবাইকে। দিয়েছে বুঝিয়েও।

গরিব চাষার ছেলে একটা মস্ত সার্কাসের মালিক হয়ে যাবে–এমনটা কে কবে ভেবেছিল শুনি!

উন্নতিটা তার এক অজগর সাপ দিয়ে শুরু। শখ ছিল মাছ ধরার। চাষবাসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাছের জন্য টইটই করে ঘুরে বেড়াত এদিক সেদিক।

বলেশ্বর নদে ভাটার সময় ইলিশের দেখা মেলে খুব। ইলিশের রুপোলি শরীরটার ওপরই নিতিনের যত লোভ। এই শরীর তাকে যতটা পাগল করে যুবতী মেয়েদের শরীরও পারে না ততটা। তাই তো দিন, রাত, নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে বারবার বলেশ্বর নদে ছুটে যাওয়া।

নদে মাছ ধরতে গিয়ে একদিন জালে ধরা পড়ে মস্ত অজগর। সে কী লম্বা !

বাবারে বাবা, সেকি ওজন তার।

অনেক কষ্ট, পরিশ্রম আর ঝক্কির পর অজগরটাকে নিয়ে আসা হয় বাড়ি। নিতিনের কান্ড দেখে তো গায়ের মানুষ থ। আর তার বাপ পারলে তো ছেলেকে চ্যালাকাঠ দিয়ে পেটায়!

ভালোই বিপাকে পড়ে নিতিন। তবে এত কিছুর পরও বাড়িতে টিকে যায় অজগরটা। তার থাকা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা খাওয়াদাওয়া নিয়ে।

আস্ত এক একটা খাসি নিমিষেই যেন সাবাড় করে দেয় অজগর। নিতিনের বাপ গরিব মানুষ। রোজ রোজ খাসির জোগাড় তো তার দ্বারা হবে না।

অবশেষে দানব সাপ বিক্রির চেষ্টা। কে কিনবে এই জিনিস! কেটেকুটে মাংস খাবে তারও তো উপায় নেই।

অজগরের জন্য নিতিনের মন খারাপ থাকে সব সময়। একদিন বাজারে গিয়ে লোক মারফত সে জানতে পারে, দূর গাঁ রাজাপুরে এসেছে সার্কাস পার্টি। সাতপাঁচ আর না ভেবে সেখানেই সওদা করতে ছোটে।

সার্কাস পার্টির লোক অজগর কিনতে রাজি হয়। জানায়, দামও দেবে বেশ ভালো। কিন্তু নিতিনের মতলব ভিন্ন। সে অজগরটা বিনে পয়সায় দিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে চাকরি নেয় সার্কাসে। পুরনো জীবনকে মুছে দিয়ে শুরু হয় নতুন জীবন।

অজগরটার সাথে এদ্দিন থাকার কারণে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। প্রেমিকা হয়ে গিয়েছিল নিতিনের এই দানব অজগর। তা সেই প্রেমিকাকে নিয়ে ব্যবসা করে ফায়দা ভালোই লুটেছে সে। সার্কাসে ধাই ধাই করে হয়েছে উন্নতি।
প্রেমিকার কপাল নিতিনের বরাবরই ভালো। কন্যা রাশির লোক সে। চেহারা বদখত হলেও মেয়েরা কারণে-অকারণে প্রেমে পড়ে। আর নিতিনের কাছে মেয়েদের চেহারা সুরত বড় কথা নয়। মেয়েদের কাছ থেকে দু পয়সা আয় হলেই হলো।
এই সার্কাসে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে তার পরিচয় রাসমনির সাথে। রাসমনি সার্কাসের অন্যতম আকর্ষণ। তার বয়স সবে ষোল বছর। গায়ের রং তামাটে। এই বয়সেও উচ্চতা মাত্র তিন ফুট। ওজনেও হালক যেন একটা হালতি পাখি।
তবে রাসমনিকে দেখতে সার্কাসে রাজ্যির লোক ভিড় করার কারণ হলো, দেখতে সে হুবহু একটা মুখপোড়া হনুমানের মতো। শরীরভর্তি লোম। শরীর থেকে গলাকে তার আলাদা করে ঠাওর করা মুশকিল। হাত আর পায়ের নখগুলো বড় বড় এবং নোংরা। দেখার মতো এক জিনিস! প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালের বড় একটা উদাহরণ এই রাসমনি!
মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পর থেকেই তাকে একনজর দেখার জন্য লোকেরা করত ভিড়।
লোমে ঢাকা একটা পুরো শরীরের মানুষ দেখতে ভিড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রথমে এমন কান্ড দেখে মা-বাবা আঁতকে উঠেছিল। বাবা তো ভেবেছিল দিয়ে দেবে জ্যান্ত কবর। কিন্তু দিন যেতেই বুঝে যায় মেয়ের বাজারমূল্য ভালো।
আশপাশের পরিচিত কয়েক লোকের সাথে কথা বলে সার্কাস পার্টিতে গুনে গুনে একশত পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রি করে সে রাসমনিকে। মেয়েটার বয়স তখন পাঁচ মাস। সেই বয়স থেকেই এই সার্কাস তার জীবন। সার্কাসই সব।
নিতিনের সাথে রাসমনির প্রেম হয় নিতিন সার্কাসে আসার সতেরো দিনের মাথায়।
সেদিন গরম পড়েছিল খুব। স্নান করার জন্য পুকুরঘাটে গিয়েছিল মেয়েটা। পাড়ের একদম কাছে দাঁড়িয়ে যখন গোটা চার ডুব দিল তখনই দ্যাখে নিতিন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। মেজাজ খিঁচড়ে গেছিল রাসমনির। তার চেহারায় কঠিন গলদ। পুরুষরা এমন করে তাকায় না তার দিকে। তো তাতে কি! মেয়েমানুষ সে। জোয়ান মরদ তাকালেই কেমন কেমন লাগে!
দোষ কিন্তু নিতিনের ছিল না। তার চোখটাই এমন যে কারো দিকে তাকালে মনে হয় ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। তা ছাড়া আফিমের নেশা হয়েছে ঢের। ঢুলতে ঢুলতে নিতিন রাসমনির দিকে গিয়ে হাতে একটা অ্যায়সা চুমু খেয়ে বলেছিল ‘পেম দিবাইন?
এমন কথা মেয়েটাকে আগে কেউ বলেনি কোনো দিন। অল্পবিস্তর ঘামছিল তাই রাসমনি। ভিজে উঠেছিল তার হাত-পায়ের বড় বড় লোম। নিতিনকে অবাক করে দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল সে সার্কাসের তাঁবুতে নিজ ঘরে। তার পরের দু-দিন আর ঘর হতে বের করা যায়নি রাসমনিকে। নাওয়াখাওয়া ভুলে সারা দিন, সারাটা রাত কেঁদেছিল মেয়েটা।
আহা রে মেয়েমানুষের মন ! কী দরকার ছিল দুঃখী মেয়েটার মনে আঘাত দেওয়ার?
রাসমনি তো ভালো করেই জানে প্রেম করতে যে চেহারা-গতর লাগে তা তার নেই। তবুও মানুষটা তাকে নিয়ে তামাশা করল। ছিঃ !
ব্যাপারটা তামাশা ছিল না। নিতিনের ব্যবসায়ী মন। সে ঠিক ঠাওরেছিল এই জিনিস ঠিকমতো ব্যবহার করলে আয় নেহাত মন্দ হবে না।
সার্কাসের মালিককে বলে বিয়ের কথা বলেছিল নিতিন। কেউ বোঝেনি তার মনের ফন্দি। রাসু আর নিতিনের বিয়ে হলে ভালোই হবে, সার্কাসেই থেকে যাবে তারা এমনটা ভেবে মেয়েটাকে ধরে বেঁধে রাজি করিয়ে বিয়ে দিয়েছিল লোকজন।
বিয়েটা সুখের হয়নি। রাসুর সাথে শোয়নি কখনো নিতিন। বাসর রাতেই সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, ‘তফাত থাকবাইন।’
নিতিন এক আজব চিড়িয়া। একসাথে শোবেই যখন না তখন বিয়ে করেছিল কী
কারণে!
এসব শোয়াটোয়া নিয়ে তার আদিখ্যেতা নেই। আফিমের নেশা, মদ খাওয়া আর সার্কাস নিয়েই সে দিব্যি দিন পার করে দেয়।
মাঝে মাঝে রাত হলে ধ্যানে বসে। একটু আধটু কালো জাদু চর্চার শখ তার। প্রায়ই চলে যায় গোরচিলায়। গভীর জঙ্গলে কবর খুঁড়ে ভেতরে বসে গান জুড়ে দেয়, ‘কিতাক যাবো, কিতাক আবো। ন জানি...ন জানি।’
এমনি একদিন গোরচিলা থেকে ঘোটকীর পিঠে চড়ে বাড়ি ফিরে রাসমনিকে কারণ ছাড়াই কঠিন মার মেরেছিল নিতিন। দুর্বল লতার মতো শরীর এই মেয়ের। অল্পতেই কাতর । তাই তো এক মারেই হয়ে গিয়েছিল শয্যাশায়ী। বন্ধ হয়ে যায় তার সার্কাসে খেলা দেখানো।
কালো জাদুর চর্চা করে বলে নিতিনকে ভয় পায় এখন সার্কাসের মালিকও। রাসমনির গায়ে হাত তোলার পর তাই কেউ টুঁ শব্দটাও করার সাহস পায়নি।

বিধিবাম ! তাই বলে সার্কাসের মালিকের জন্য এতটা বাম হবে বোঝেনি সে আগে। একবার বিছানায় পড়ার পর আর উঠতেই পারল না রাসমনি।

নিতিন স্ত্রীকে ঘরে রেখেই সেবা করত। কেউ দেখা করতে পারত না রাসমনির সাথে। নিতিন দেখা করতে দিত না। তার আদেশ, কঠিন আদেশ ! কেউ ভঙ্গ করলেই হয়তো মেরে বসবে বাণ!

সার্কাসের ব্যবসা লাটে উঠতে দেরি হয়নি বেশি। হন্যে হয়ে খদ্দের খুঁজছিল সার্কাসের মালিক। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে সময় সার্কাসটা কিনে নিয়েছিল নিতিন। কোন ফাঁকে সে জমিয়ে ফেলেছিল এত টাকা বোঝাই যায়নি!

নিতিনের মনে বেজে উঠেছিল খুশির নাগাড়া।

মালিক হওয়ার পর আফিম ছেড়ে দেয় সে। সারা দিন কাজ আর কাজ। রাসমনিকে বের করা হয়েছিল ঘর থেকে। হুবহু এক হিংস্র শিম্পাঞ্জির সাজ দিয়ে তাকে তোলা হয়েছিল মঞ্চে। রাসমনির খেলা দেখার জন্য ভিড় করেছিল হাজার খানেক মানুষ। সে এক কান্ড বটে !

রাজকপালে নিতিনের দিন ফেরার পর আগের সার্কাসের লোকজন ধরতে পেরেছিল তার চালাকিটা। বুঝেছিল রাসমনিকে ঘরে আটকে রাখার কারণ। কেউ কেউ গালি দিয়েছিল নিতিনকে আবার কেউ তার চালাকির জন্য প্রশংসা করে বলেছিল, 'ব্যাটা বটে নিতাইন। কামটা করিচে কি দেকচাইন !' এই গালি, প্রশংসা কোনোটাই নিতিন গায়ে মাখেনি। সে একদিন রাজা হবে। এসব গায়ে মাখলে কী চলে!

পিঠেপিঠি পার হওয়া দিনগুলো ভালো যাচ্ছিল খুব। নিজের সাফল্যে আনন্দিত মানুষটি একদিন তাই শালপাতা কুড়ানোর সময় আদর করে বসে রাসমনিকে। সেদিন ভোরে উঠে নিতিনের মুখে, শরীরে লেগে থাকা লোম দেখেই আঁচ করতে পেরেছিল লোকজন ঘটনাটা। আনন্দের দিন নিতিন আর রাসমনির। তবে এই আনন্দের দিনেও লোভ তাকে ছেড়ে যায়নি। তার লোভটা ভয়ংকর। একটু বেশি রকমের ভয়ংকর।

ব্যবসার উন্নতির জন্য নিত্যনতুন ফন্দি-ফিকির বের করে সে। টাকা, অনেক টাকার জন্য তাই তো রাসমনিকে মেরে ফেলে। পলকা শরীরের স্ত্রীকে মারতে বেশি কসরত করতে হয়নি। মরা হাতির অনেক দাম। মরা রাসমনিরও দরও কম নয়। বড় এক ব্যবসায়ী দাম হেঁকেছে হাজার খানেক টাকা। রাসমনির দেহটা দরকার তার। মমি বানিয়ে বাক্সে ভরে এই দেহ নিয়ে যাওয়া হবে শহরে। তারপর খেলা দেখিয়ে করা হবে আয়।

এই ব্যবসার চিন্তা যে নিতিনের মাথায় ছিল না তা কিন্তু নয়। শুরুতে বিনিয়োগের পয়সাটা নেই বলেই ছেড়ে দিচ্ছে মেয়েটার দেহটা। নইলে নিজেই করত এ ব্যবসা। যে ব্যবসায়ী কিনেছে দেহটা সে উপহার, উপরি হিসেবে দিয়েছে কিছু মোহর। সেই মোহর নিয়েই জঙ্গলের পাড় ঘেঁষে যাওয়া নদীর জলে ঠায় দাঁড়ানো নৌকায় অপেক্ষা করা ব্যবসায়ীর হাতে রাসমনির লাশ তুলে দিতে যাচ্ছে সে। লাশ পৌঁছে দিলেই পাওয়া যাবে বাকি টাকাটা।

কাজ শেষে ঘোটকীকে নিয়ে পালাবে সে। চলে যাবে অনেক দূরের কোনো এলাকায়। সেখানে গিয়ে এই টাকা দিয়ে আরো বড় করে শুরু করা হবে নতুন কোনো ব্যবসা। নতুন জীবনে নতুন ব্যবসা।

সার্কাসটা কাউকে না জানিয়েই গোপনে বিক্রি করে দিয়েছে সে। কাল ভোর হওয়ার আগে কেউ টের পাবে না রাসমনির ঘটনাটাও।

এই রাত তার জন্য বড় আশীর্বাদের। ভগবানের কথা ভেবে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে নিতিনের। মনে মনে প্রার্থনা করে বলে, 'ভগবান, সবসোম পাশে থাকবাইন। থাকবাইন। '

কিন্তু ভগবান পাশে থাকেন না। তার বাস মনে। সেই মন বড় নড়বড়ে। কারণে- অকারণে হয় উচাটন। এই যেমন এখন সে লাশ নিয়ে নদীর পাড়ে যাবে না বলে ঠিক করে। তার ইচ্ছে করে কিছুটা সময় কাটাতে গোরচিলায়। হাঁপিয়ে ওঠা ঘোটকীও পথ পরিবর্তন করে অন্যদিকে ছোটে। এ সব কিছুই তো ভগবানের কান্ড! নিতিনের কি আর এখানে হাত আছে! এ মুহূর্তে সব আঁধার দূর করে চাঁদ নেমে এসেছে পৃথিবীর একদম কাছাকাছি। অন্ধকার জঙ্গলে আচমকাই যেন নেমে আসে দিন।

ঘোটকীর পিঠ থেকে নেমে লাশ আর মোহর নিয়ে নেমে যায় নিতিন কবরে। তারপর ধ্যানে বসে। বলেশ্বর নদে ধরা পড়া অজগর, নিজ ঘরে বসে দুপুরবেলায় খাওয়া ইলিশের ঝোল, সার্কাসের বুড়ো বাঘ আর অন্য দশটা কিশোরীর মতোই তিরতির করে কাঁপা রাসমনির চোখের পলক সব কিছু একে একে সামনে চলে আসে। মাথার ভেতর বইতে থাকে ঝড়। ' রাসু, তুই বাধা দিলি না ক্যানে। তুরেতো বালুবাসিতাম। ক্যানে, ক্যানে, ক্যানে... ।' বলে কাঁদতে থাকে নিতিন। আফিমের নেশা গাঢ় হয়। চুমোয় চুমোয় ছবি আঁকে রাসমনির শরীরে। তার মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে করে কান্না। করে বিলাপ। আহা রে কই ছিল এত্ত প্রেম, এত্ত আবেগ। ব্যবসার মারপ্যাঁচে এবার বুঝি মারই খেয়ে গেল সে।

সব মোহর পড়ে থাকে কবরের মাটিতে। বড় অবহেলায়। ওসব ছোঁয়ার কেউ নেই এখন। নিতিনের একি হলো?

ভগবান বেইমানি করে। কঠিন বেইমানি। ধ্যানে বসেও নিতিন অপেক্ষা করে কবে কাটবে এই প্রহর। কবে ঠিক হবে ভগবানের মতিগতি !

নদীর জলে চাঁদের আলো পড়ে। মস্ত চাঁদের আলো। এই আলো হা করে গিলে খায় নদীটাকে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। বিভীষিকাময় রাত। মোহরের ঝনঝনানি, শরাব আর নর্তকীদের কোমরের ঢেউয়ে পার হয় লাশের জন্য অপেক্ষা করা সওদাগরের সময়। নৌকা দাঁড়িয়ে থাকে ঘোটকীর মতোই চুপচাপ। প্রভুর নির্দেশের অপেক্ষায়।

একজন পার্থিব, জাগতিক সুখ নিয়ে আর একজন কবরের ভেতরে বুঁদ হয়ে বসে থাকে অপার্থিব আনন্দে।

সুখ। কী দারুণ হুঁশ লোপ করে দেওয়া সুখ। নিতিন দীক্ষা নেয়, প্রেম বোঝে। যে প্রেমের রঙে ফিকে হয়ে যায় মোহরের সোনালি রং। ফিকে হয়ে যায় লোভ, ঘৃণা, হিংসা...সব। সব।

---o---

**ছায়ালোকে মায়া**

---

---

বাবার মুখে বালিশটা চেপে ধরলাম আমি।

নরম বালিশ। পরিমাণমতো তুলো দিয়ে ভর্তি। ঘুমানোর জন্য ভালো। আরামদায়ক।

তার পরও নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল বুড়োটার।

হওয়াটাই স্বাভাবিক। গায়ে জোর কম নেই আমার।

তা ছাড়া বুড়ো ক্যান্সারের রোগী। একটা বিশ্রী চামড়া দিয়ে মোড়ানো শরীরে কঙ্কাল, ধমনিটমনির ভেতর দিয়ে কোনো রকমে প্রাণটা লুকিয়ে ছিল বুড়ো বাবার।

মরে যাওয়ার আগে বড় শান্ড় ছিল সে। হাঁসের বড় ডিমের মতো চোখ দুটো মেলে শুধু বাঁচার আকুতি জানিয়েছিল একবার। হাত আর পা দুটো দিয়ে আমি আর আমার কলেজপড়ুয়া বড় ছেলেটিকে সামান্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি কোনো।

দেহ থেকে তার দুর্বল প্রাণটাকে তাড়াতে খুব বেশি সময় লাগেনি আমাদের।

বড়জোর পাঁচ কি ছয় মিনিটের মধ্যে মারা যায় বাবা।

বাবাকে হত্যার দায় আমি নিতে রাজি নই। এটা ক্যান্সারেরই দোষ।

এমনিতেই মরে যেত লোকটা। কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। আমি শুধু বাবার কষ্টটা কমিয়েছি। আর বিনিময়ে তার প্রিয় ছেলে হিসেবে যতটুকু পাওনা নিয়ে নিয়েছি তা।

মৃত্যুর আগে শেষ কয়টা দিন বাবা ছিলেন আমার সাথে। আমি, আমার স্ত্রী আর সন্তানেরা কষ্ট করে তাকে দেখে রেখেছি। অন্য ভাইবোনগুলো মাঝে মাঝে কমলা, আপেল আর আঙ্গুর নিয়ে এসেছে। বাবাকে কিছুক্ষণের জন্য চেহারাটা দেখিয়ে গিয়েই পালন করেছে দায়িত্ব।

এর পরও বাবা সব সন্তানকে সমান চোখে দেখবে–এটা মেনে নিতে পারিনি আমি। এমন অবিচার সহ্য করা যায় না। আমি কেরানির চাকরি করি। আমার পরিবার আছে। পরিবার ঠিকঠাকমতো চালাতে কষ্ট হয় খুব। বাবার উচিত ছিল আমার কথা আলাদাভাবে ভাবার। তিনি ভাবেননি। আমার রাগ হয়েছে। কঠিন রাগ। সে রাগের কথা এই মৃত্যুশয্যায়ও ভুলতে পারছি না আমি।

সকাল হচ্ছে। হু হু করে শীতল হাওয়া ঢুকছে জানালা দিয়ে। আমি মারা যাব কিছুক্ষণ পরই।

মৃত বাবা এ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছেন আমার পাশে। পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন চুলে। নড়াচড়ার শক্তি নেই আমার। থাকলে বাবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতাম এতক্ষণে। আমার রাগ এত সহজে যাবে না। মরে যাওয়ার আগে দরকার নেই আমার তাকে।

বাবার একটু দূরেই মা দাঁড়ানো। শুধু মা-ই নয়, পরিবারের যারাই মৃত তারাই হাজির হয়েছেন এই ঘরে।

আমাকে নেওয়ার জন্য। আমার কষ্টটা কমানোর জন্য।

ক্যান্সারে এত কষ্ট জানা ছিল না আমার। এসব নিয়ে ভাবিওনি কখনো। আমি ব্যস্ত ছিলাম। ভয়ানক ব্যস্ত। নিজের আর নিজের পরিবারের মানুষগুলোর সুখের জন্য ছুটেছি দিনমান।

ছেলের দামি মুঠোফোন লাগবে, বউয়ের গাড়ি দরকার, মেয়ের দরকার গহনা। তাদের চাওয়াগুলো পূরণের জন্য ছুটতে খারাপ লাগেনি একদম।

বড় মধুর ছিল সময়গুলো। নিজের ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীর শখগুলো মেটানোর আনন্দই অন্য রকম। পাইনি সময় শরীরের দিকে নজর দেওয়ার ।

নজর দেওয়ার দরকারটাই বা কি?

আমি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আড়চোখে জানালার বাইরের কুয়াশা দেখি। কী সুন্দর সাদাটে রং। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছে করে একটু কুয়াশা মুখের ভেতর নিয়ে খেয়ে দেখি। টক না ঝাল তা পরখ করি।

ছোটবেলা থেকে সুন্দর জিনিস দেখলেই আমার খেতে ইচ্ছে করে। তা সে খাদ্যদ্রব্য হোক আর না হোক। আমার মনে হতো কোনো জিনিস খেয়ে ফেললেই তা নিজের হয়ে যায়। তাই চোখের সামনে পড়া সুন্দর জিনিসগুলো খেয়ে আমি আমার নিজের করতে চাইতাম।

কুয়াশার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে কুয়াশা হাত দিয়ে ধরতে পারতাম না। বারবার পিছলে হাত গলে বেরিয়ে যেত।

আমার নাকে এখন রাইসটিউব ঢুকানো। শরীর টিকবে না আর বেশিক্ষণ। কেউ একজন শিগগিরই আসবে প্রাণ নিতে। শরীর পচতে শুরু করেছে। জিহ্বা ফুলে ঢোল হয়ে আছে।

এমন অবস্থায়ও তেষ্টা পেয়েছে খুব। শরীরে শক্তি থাকলে আর বুড়ো আঙুলটা নাড়াতে পারলে আঙুলটা মুখের ভেতর দিয়ে রাখতাম। তাতে তেষ্টা কিছুটা কমত।

আমার কথা বলার ক্ষমতা নেই। কথা বলতে পারলেও পানি চাইতাম না কারো কাছে। আমার শিক্ষে হয়ে গেছে। তেষ্টা পেলেই সব সময় সবার কাছে পানি চাইতে নেই।

কয়েক দিন আগেও যখন একটু সুস্থ ছিলাম, কথা বলতে পারতাম তখন বড় ছেলের কাছে পানি চেয়েছিলাম।

কী কারণে জানি না সারাক্ষণই তেষ্টা পেত। পানি পানি বলে চিৎকার করতাম। সে সময় একবার, দুবার পানি দেওয়া হতো মুখে। শেষের দিকে বিরক্ত হয়ে খেপে গিয়েছিল আমার পরিবার।

পানি চাইতেই বড় ছেলেটা হাসপাতালের বাথরুমে নিয়ে ঝরনার নিচে দাঁড় করিয়ে দেয় আমাকে। হাসপাতালের রোগী রোগী গন্ধ পানির বালতিতে জোর করে মুখটা ডুবিয়ে বলেছিল, 'খা। পানি খা। যত পারিস খা। খুব যন্ত্রণা দিচ্ছিস শালা। তোর পানির পিপাসা আইজ জনমের তরে মেটাব।'

ছেলের আমার মেজাজ খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। ওর জায়গায় থাকলে আমারও হতো। ছেলের দোষ দেব না। দিতে নেই। মা, বাবা অসন্তুষ্ট হলে সন্তানের অমঙ্গল হয়। আমার বড় ছেলের খারাপ কিছু হোক এটা আমি চাই না।

আমার শুধু মন খারাপ হয়েছিল ও আমাকে শালা বলেছে দেখে। বাবাকে যে শালা বলতে নেই। আমাকে পানিতে চুবানোর সময়ও প্রচন্ড কষ্ট নিয়ে আমি বলেছি, 'শালা বলিস না। বাবাগো শালা বলিস না।'

ছেলে আমার কথা শোনেনি।

উল্টো পানি থেকে চুবিয়ে এনে আমার মুখে জোর করে ঘুমের ওষুধ গুঁজে দিয়েছে।

বোকা ছেলে। ঘুমের ওষুধ খেলে তো আমার ঘুম হয় না। বরং আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকি। ঘোরের মাঝে থেকে আবছায়া একটা জগতে চলে যাই। সে জগৎ বড় সুন্দর। সেখানকার সব কিছু বড্ড রঙিন। সে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন। সোনার সময়।

শৈশবে আমি কাঁচাগোল্লা খাওয়ার জন্য বাবার কাছে আবদার করি। রান্না করা ডাহুকের নরম মাংসের ঝোলে ডুবানো আলু আমাকে পাগল করে দেয়। চৌপর দিন পুকুরের শান্ত জলে দাপাদাপি করলেও ক্লান্ত হই না।

বাবা ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে তিব্বত ৫৭০ সাবান দিয়ে আমাকে গোসল করায়। তেলে ডুবানো চুলে কাকুই চালিয়ে গালে থ্যাবড়া এক চুমো দিয়ে মা বলে, 'খোকন, অনেক বড় হয়ে আয়। জজ হয়ে আয়। ব্যারিস্টার হ।' আমি শালা কেরানি হব। মায়ের কথা শুনলে কি আমার চলে !

আধো ঘুম আধো জাগরণের ভেতরেই মনে পড়ে যায় কৈশোরের জুলেখার কথা।

জুলেখা বিষপিঁপড়ের মতো সুন্দর। সুন্দর জরিওয়ালা সোনালি পোকার মতো। আমার ওকে পিষে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে।

খেয়ে ফেলে ইচ্ছে করে জোরে ঢেকুর তুলতে।

ওর পায়ের দিকে তাকালে আমার ভেতরে ঝড় ওঠে। এত সুন্দর পা-কি মানুষের হয়! হতেই পারে না। বাজি, বাজি, বাজি। জুলেখা পরী ছিল।
ওর পায়ের স্বচ্ছ, নরম চামড়ার নিচে রক্তের চলাচলও সহজে ঠাওর করতে পারতাম আমি। জুলেখার পায়ের নূপুর দুটো ছিল আমার প্রিয় খেলনা।
মেয়েটা প্রায়ই বিরক্ত হয়ে আমাকে বলত, 'নূপুর নিয়া আপনের এত কী। শইলের কোনো জায়গায় হাত দেন না, খালি নূপুর নিয়া ছানাছানি। এমন পুরুষ তো দেহি নাই আগে আর! '
আমি জুলেখাকে বিয়ে করিনি। তার বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো না। সে দুই ঘরের নামতা বলতে গেলেই গড়বড় বাঁধিয়ে দেয়। এমন মেয়ে বিয়ে করতে নেই।
বিয়ে পরিবারের অন্যতম সেরা বিনিয়োগ। এ ক্ষেত্রে লোকসান করে বোকারা। আমি এত বোকা ছিলেম না।
কলেজে উঠতে না উঠতেই বুদ্ধিমান আমি তাই বিয়ে করে ফেলি। বুদ্ধিমানরাও ভুল করে কখনো কখনো। আমিও করেছি।
বউ আমার ভালো না। না চেহারা ভালো, না চরিত্র ভালো।
আমরা একে অপরকে কখনো ভালোবাসিনি। তবে ভালোবাসা না থাকলেও চার চারটে সন্তানের বাবা হয়েছি।
আমার সন্তান। আমার রক্ত।
ভালোবাসা থেকে জন্ম না হলেও ওদের শরীরে আমার রক্তের অস্তিত্ব আমি অনুভব করি। প্রতি মহূর্তে।
আমার মৃত্যুশয্যায় ওরা এখন বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। আমার ছোট ছেলেটাকে মাথা কাত করে ভালো করে দেখার চেষ্টা করি। পারি না।
চোখের মণিটা ডানদিকে হেলাতেই ছোট ছেলেটির মুখ পর্যন্ত দেখা যায়। কমলা খাচ্ছে সে।
কোয়ার ভেতরে থাকা বিচিগুলো সরিয়ে খেতে মহা কসরত করতে হচ্ছে তাকে। বোকা এই ছেলেটার জন্য কষ্ট হয়।
কপালে দুঃখ আছে তার।
বড় ভাই তাকে কানাকড়িও দেবে না। সে পড়বে কঠিন বিপদে।
ছেলেমেয়েদের আমার কারোরই বাবাকে নিয়ে কোনো চিন্ড্রা নেই। বাবাকে হারানোর শোক তাদের বিচলিত করবে না।
সন্তানদের এমন আচরণে আমি কষ্ট পাই। কান্না পায়। মনে মনে প্রার্থনা করে বলি, 'পরম করুণাময় আমাকে শক্তি দাও। কষ্ট সহ্য করার সাহস দাও। আমার মৃত্যু আরামদায়ক হোক। হে সৃষ্টিকর্তা, আমার পরিবারকে তুমি দেখে রেখো।'
বড় ছেলেটা ঘরের ভেতর বিড়ি ধরায়। ঘরভর্তি করে ধোঁয়া ছাড়ে। আমি অবাক হই। ধূমপানে বিষপান। ছেলের সাবধান হওয়া উচিত।
রোগীর ঘরে ধোঁয়া ছাড়লেও কেউ তাকে কিছু বলে না। আমার অবর্তমানে সেই-ই অভিভাবক। ধোঁয়া ছাড়ার অধিকার তার আছে।
আমার বউ কোরআন শরিফ নিয়ে বসেছে। আমার ভাইবোনেরা চলে এলেই সে তিলাওয়াত শুরু করবে। একটু একটু কাঁদবেও। স্বামীর মৃত্যুতে বউ কাঁদবে না এটা কেমন কথা!
লোকে খারাপ বলবে। ভাইবোনেরা মন্দ কথা শোনাবে।
সময় ঘনিয়ে এসেছে আমার। তিনি চলে এসেছেন। পালস্ রেটের ব্যাড়াছ্যাড়া অবস্থা। আমাকে তওবা করতে হবে। সব পাপের জন্য চাইতে হবে ক্ষমা। বেহেশত্ হাতছাড়া করা যাবে না।
অনেক কাজ বাকি থেকে গেল। অনেক কথা বলা হলো না।
দুপুরের শেষভাগের ইকড়ি মিকড়ি ছায়ার মতোই অল্প সময়ের জন্য এসে আবার মিলিয়ে গেলাম আমি। বড্ড দ্রুত শেষ হতে যাচ্ছে সব। শেষ হতে যাচ্ছে এলোমেলোভাবে।
মৃত্যুর আগে অল্প সময়ের ভেতর দারুণ কোনো স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করি। মনে আসে না। শেষ সময়ে মনে এসে হানা দেয় হেনা নামের কিশোরী একটি মেয়ে। ছিঃ ছিঃ একি কান্ড!
কলেজে থাকতে হেনাদের বাড়িতে লজিং থেকে পড়াশোনা করতাম আমি। হাস্নাহেনার ঘ্রাণ ছড়িয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আমার ঘরে সে আসত পাটিগণিত বুঝতে। একদিন বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় তাকে একা পেয়ে জোর করে ঠোঁটে চুমু খেয়ে বসি। হেনা বাধা দিলেও শক্তিতে কুলোতে পারে না। উগ্র রিংরসায় মন্থন করা হয় তাকে।
'ভাইজান। মাফ করেন। ভাইজান..।' কান্না নিয়ে বলা এ কথাগুলো থামাতে পারেনি আমায় সেদিন। পাপ করেছি। কঠিন পাপ।
আমার আরো মনে পড়ে যায় মায়ের গোমরা মুখের কথা। বউয়ের গহনা হারিয়েছে বলে তাকেই ঠাওরানো হয়েছিল চোর বলে। বারবার চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে সে বলছিল, 'বাবারে, খোকনরে গয়না দিয়া আমার কী হবো! আমার গয়না তো তোরা। আমার পেটের বাচ্চারা। তোরা আমারে লজ্জা দিস না। বউমার সামনে আমারে চোর কইস না।' ছেলের

বউয়ের পা ধরতেও কসুর করেনি সে সেদিন। তবে লাভ হয়নি। নিজের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি বৃদ্ধ মাকে। চিরদিনের জন্য। মা আত্মহত্যা করেছে। নাটক-সিনেমার মতো অভিমান করেছে ছেলের ওপর। অভিমান করে যে মা এমন চলে যেতে পারে, তার মৃত্যুতে কাঁদা উচিত না। আমিও কাঁদিনি।

আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড। স্মৃতিগুলো সব ধোয়া হয়। ধোয়া হয়ে উবে যায় মাথারই ভেতর।

আমার বড় ছেলেটা এগিয়ে আসছে। আমার দিকে। ওর চোখে পশুর হিংস্রতা । তার হাতে বালিশ।

নরম ও কোমল তুলো দিয়ে ভর্তি।

আফসোস। আমার সবই তো ছিল এই বোকা ছেলেটার জন্য। সামান্য লোভে আমারই মতো বাবাকে কেন মেরে ফেলতে হবে। অনুতাপ হয়। রাগটা পড়ে যায় নিজের বাবার ওপর থেকে।

আচমকা অন্ধকার সব। কানে আসে বউয়ের কোরআন তিলাওয়াতের সুর। ভাইবোনগুলো চলে এসেছে হয়তো। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাই আমি। বেডের একদম কাছে চলে এসে মৃত মা আমার মুখটা বুকে চেপে ধরে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমি রাগ করিনি খোকন। রাগ করিনি।'

বাবা একটু রাগ করে। বলে, 'এত অল্পতেই কাহিল হয়ে গেলি। তুই যখন আমার মুখে বালিশ চেপে ধরেছিলি তখন কষ্ট হয়েছিল আরো বেশি। একটু সহ্য কর। '

বাবাকে ক্যামনে বোঝাই এত কষ্ট আমার সহ্য হয় না। হয় না।

মৃত্যুর সামান্য কিছু আগে আমার চোখ হতে গড়িয়ে পড়ে এক ফোঁটা জল। শুকনো গাল বেয়ে সরলরেখায় পড়তে পড়তে সে জল নিচের দিকে যেতে থাকে।

মা আমার চোখের জল মুছে দাও।

বাবা আমার চোখের জল মুছে দাও।

মুছে দেবার কেউ নেই। কেউ নেই... ।

----o---